# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

চতুরশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা
বৈশাখ-আশ্বিন

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক
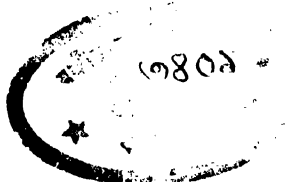
৮৪তম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*

৮৪তম বর্ষ ॥ সংখ্যা : ১ম-২য়

## সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৮৪ ॥ সংখ্যা : ১-২

# ৺সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

রবিবার ২৯শে মে অপরাহ্ণে কলিকাতা রেডিয়ো অফিস হইতে টেলিফোনে একজন আমাকে বলিলেন, আপনি সুনীতি চ্যাটার্জী সম্বন্ধে কিছু বলিবেন, আমরা আসিতেছি। আমি বলিলাম—কি ব্যাপার ? উত্তর হইল—আপনি জানেন না ? কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—আমরা তাঁহার বাড়িতে যাইতেছি, সেখান হইতে আপনার নিকট যাইব। শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। একটু পরে বলিলাম, আমিও তাঁহার বাড়িতে যাইতেছি, সেখানেই দেখা হইবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার বাড়িতে গেলাম, দেখিলাম পাড়ার কয়েকটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা বলিল, হাসপাতালে সুনীতিবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। এ জীবনে আর তাঁহার দেখা মিলিল না।

সুনীতিবাবুর বয়স হইয়াছিল ৮৭ বৎসর, তাঁহার মৃত্যু অপ্রত্যাশিত নয়—কিন্তু ইহা এতই আকস্মিক যে আমি বেদনায় অভিভূত হইলাম। আমার শরীর বড়ই দুর্বল, সুতরাং এই দুঃসংবাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া— কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু বাড়িতে আসিবার পরও নীরবে এই বেদনার অনুভূতি সহ্য করিবার সুযোগ হইল না। রেডিয়ো, টেলিভিশন ও কয়েকটি সংবাদপত্র হইতে অনবরত টেলিফোন—কিছু বলিতে হইবে। যথাসম্ভব কিছু বলিয়া অথবা পরদিন বলিবার আশ্বাস দিয়া সকলকে নিরস্ত করিলাম। কিন্তু প্রায় সারা রাতই প্রিয় বন্ধুর মহাপ্রয়াণের কথা এবং অতীত দিনের অনেক স্মৃতি মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল, কেবলই মনে হইতে লাগিল আজ বঙ্গদেশে তথা ভারতে সুনীতিবাবুর শ্রেণীর মনীষী-সাহিত্যিক অতিশয় দুর্লভ—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তারপর ছাত্রজীবন হইতে তাঁহার সমগ্র জীবনের অনেক স্মৃতি মনে জাগিল। আমি যে বছর (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম. এ পাশ করি, সুনীতিবাবু সেই বছর (১৯১১ খ্রী.) ইংরেজী সাহিত্যে বি. এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার পরেও পূর্বের ন্যায় কলিকাতা University Institute-এ তিনি ও তাঁহার সহপাঠী শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হইত। পরবর্তী জীবনে সুনীতিবাবুর

টাভিনয়ে বিশেষ আগ্রহ ও আসক্তি জন্মে—তাহার উৎপত্তি সম্ভবতঃ এইখানেই হয়। হাদের সকলের সঙ্গেই এখানে আমার যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, আমরণ তাহা ক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং প্রায় সত্তর বৎসর সুনীতিবাবুর ও আমার মধ্যে সৌহার্দ্য র্তমান ছিল।

সুনীতিবাবু ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করিলেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষাতত্ত্ব ম্বন্ধে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। আজীবন তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন—কিন্তু Origin and Development of the Bengali Language নামক গ্রন্থই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কীর্তি। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার বহু পূর্বে দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত সুনীতিবাবুর গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির—শুনিয়াছি যখন এই বিষয়ে সুনীতিবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি Thesis লেখেন তখন পরীক্ষকগণ এই সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

সরকারী বৃত্তি পাইয়া সুনীতিবাবু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং Indo-Aryan Philology সম্বন্ধে Thesis লিখিয়া D. Litt. উপাধি প্রাপ্ত হন (১৯২১ খ্রী) অতঃপর প্যারিসে যাইয়া সেখানেও গবেষণা করিয়া সম্মানিত উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Khaira Professor of Indian Linguistic and Phonetics নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের Emeritus Professor of Comparative Philology নিযুক্ত হন।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে সুনীতিবাবু বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। "Origin and Development of the Bengali Language" গ্রন্থের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৯৭০-৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের Allan Unwin কোম্পানি তিন খণ্ডে ইহা পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির উল্লেখ করিতেছি :

১। India and Ethiopia from the 7th Century B. C.

২। Kirata-Janakirti—The Indo-Mongoloid.

৩। Religious and Cultural Integration of India.

৪। Indo-Aryan and Hindi.

৫। Iranianism.

৬। Bengali Phonetics.

৭। বাংলাভাষা প্রসঙ্গে।

ইহা ব্যতীত বোম্বে হইতে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত একাদশ খণ্ডে সম্পূ

'History and Cul:ure of the Indian People' গ্রন্থের প্রায় প্রতি খণ্ডে তিনি বঙ্গভাষা, হিন্দী প্রভৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি কেবল ভারতবর্ষে নহে, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং উত্তর-পশ্চিম এশিয়ায় বহু সভা-সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া বহু ভাষণ দিয়াছেন, এখানে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য ছাড়াও তিনি অন্য বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। নাট্যকলা সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের L gislative Council-এর সভাপতি নির্বাচিত হইয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছেন।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় অধ্যাপক ও দিল্লীতে সাহিত্য একাডেমির সভাপতি এবং আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়াছিলেন।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'নালন্দা মহাবিহার' তাঁহাকে ও আমাকে 'বিদ্যাবারিধি" উপাধি দান করেন। আমরা দুই জন একসঙ্গে নালন্দায় যাই ও তথায় একত্রে বাস করি। এই কয়দিনের সান্নিধ্যের স্মৃতি কখনও ভুলিব না। প্রাচীন নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। নালন্দা হইতে প্রাচীন রাজগৃহে গিয়াছিলাম। যাইতে যাইতে পথে আমাদের সঙ্গী নালন্দার ভাইস চ্যান্সেলর একটি ময়রার দোকান দেখাইয়া বলিলেন, এখানে খুব ভালো মিঠাই তৈরি হয়। সুনীতিবাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামাইয়া দুই একটি মিষ্টি খাইয়া কলিকাতায় তাহার কয়েক সের নিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজগৃহে যাইয়া উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করিলেন।

রাজগৃহের এই কয়টি দিনের স্মৃতি কখনো ভুলিব না। কারণ এইরকম সুযোগেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। আমার ঘনায়মান জীবন-সন্ধ্যায় একজন আযৌবন সুহৃদের সঙ্গে কয়েকদিন নালন্দায় বসবাসের কাহিনীর সহিত সুনীতিবাবুর প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

---

# তাঁহাকে কেন ভালো লাগিত

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল )

শ্রদ্ধেয় আচার্য্য সুনীতিকুমারের সম্বন্ধে কি লিখিব ভাবিতে গিয়া একটু মুশকিলে পড়িয়াছি। তাঁহার বিপুল বিদ্যার জয়জয়কার করিলেই কি তাঁহার প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে? তিনি ভাগ্যবান্ ছিলেন, বরাবরই গভর্নমেন্টের সুনজরে পড়িয়া বড় বড় পদাধিকারী হইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। এই ঘটনাগুলিকে বিস্ফারিত করিয়া ধরিলেই কি তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে? না। রাজার মণি-মুক্তা-খচিত মুকুট, বা বহু-মূল্যবান্ রাজপরিচ্ছদের বর্ণনায় রাজার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজা নামক ব্যক্তিটির পরিচয় অন্য মাপকাটি দিয়া মাপিতে হয়। সে মাপকাটি প্রত্যেকের অন্তরে থাকে। সে মাপকাটি এক রকম নয়। আপনার সুনীতিকুমার আর আমার সুনীতিকুমার এক ব্যক্তি না-ও হইতে পারেন।

প্রতিভাবান্ ব্যঙ্গ-সাহিত্য-রচয়িতা ও কার্টুনিস্ট ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে আমার শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাকে একটি অদ্ভুত উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—যদি কাহারও নামে নিন্দা শোন, তাঁহার সহিত গিয়া আলাপ করিও। দেখিবে নিশ্চয় তিনি গুণীলোক। এদেশে গুণী লোকেরাই সর্বদা নিন্দিত হন। রামমোহন রায় হইতে শুরু করিয়া সব গুণী ব্যক্তিই এদেশে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন এদেশের লোক বিদ্যাসাগরের বাড়িটা পর্যন্ত পোড়াইয়া দিয়াছিল। পেচকেরা আলো সহ্য করিতে পারে না।

আমি যখন 'শনিবারের চিঠি'তে লেখা শুরু করি তখন মাঝে মাঝে শনি-চক্রের আড্ডায় যাইতাম। সেখানে মাঝে মাঝে সুনীতিবাবুর নাম শুনিতাম। দুই একজন তাঁহার নিন্দাও করিতেন। বলিতেন তিনি না কি দাম্ভিক, তিনি না কি খোশামোদ-প্রিয়, তিনি না কি নানা মতলবে ঘোরেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার কৌতূহল মনে জাগিল। কিন্তু আমি ভাগলপুর হইতে মাঝে মাঝে আসিতাম। বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতাম না। তবু ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একদিন দেখা হইয়া গেল। শনিবারের চিঠির অফিসের টেবিলে খবরের কাগজ পাতা, তাহার উপর প্রচুর মুড়ি ও বেগনি স্তূপীকৃত, সকলের মুখ চলিতেছে, তর্কের তুফান বহিতেছে, এমন সময় সুনীতিবাবু প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতেও বেশ বড় এক ঠোঙা চিনা-বাদাম। তাঁহার প্রাণবন্ত স্পর্শে আমাদের আড্ডা আরও জমিয়া উঠিল। সেই আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়। তাহার পর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি আমার

গুরুদেব বনবিহারী বাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। বাঘের পিছনে যেমন ফেউ লাগে এদেশে ভালো লোকদের পিছনে তেমনি লাগে নিন্দুকেরা।

আজ আত্ম-বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া নিজেকেই প্রশ্ন করিতেছি সুনীতিবাবুকে এতো ভালো লাগিয়াছিল কেন? মন যে উত্তর দিতেছে তাহাতে বিস্মিত হইয়া যাইতেছি। যে ভাষা-বিজ্ঞানে গাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত, সে ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি সৃষ্টি-ধর্মী বা কাব্য-ধর্মী কোনও উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচনা করেন নাই। তাঁহার সমস্ত রচনাই গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তবু কেন তাঁহাকে ভালো লাগিয়াছিল? প্রথম কারণ বোধহয় তিনি সুরসিক ছিলেন বলিয়া। যদিও তিনি কাব্য লেখেন নাই, কিন্তু কাব্য-রস উপভোগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার প্রচুর ছিল। রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত ছিলেন তিনি। নিজেও তিনি রসিক পুরুষ ছিলেন। কথায়-বার্তায় তাঁহার রসিক মনের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। তাঁহাকে ভালো লাগিবার ইহা একটা কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নহে, আরও কারণ আছে। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একজন নির্ভীক যোদ্ধা ছিল। বিরোধীদের দেখিয়া তিনি কখনও পিছু হটেন নাই—আস্তিন গুটাইয়া আগাইয়া গিয়াছেন। যাহা ভালো বলিয়া, সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়িবার সাহস ও সামর্থ্য তাঁহার ছিল। তাঁহার এই পৌরুষের জন্য তাঁহাকে খুব ভালো লাগিত আমার। ভালো লাগিবার আর একটি কারণ তাঁহার স্ত্রী। তাঁহাকে বৌদি বলিয়া ডাকিতাম এবং তিনি সত্যই আমাকে দেবর-তুল্য স্নেহ করিতেন। আমার মেয়ের জন্য পাত্রও খুঁজিয়া ছিলেন তিনি সে সময় যখন তাঁহার বাড়িতে যাইতাম তখন খোলাগায়ে সুনীতিবাবুর যে জ্যেষ্ঠ-তুল্য সহৃদয় রূপ দেখিয়াছি তাহা বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের গৃহকর্তার চেহারা। সেখানে কোনও আতিশয্য নাই। বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা ছিল না, তাহা শুধু সৌজন্য ও ভালবাসার অকৃত্রিম প্রকাশ। একটি পুস্তকের সন্ধানে একদিন তাঁহার বাড়িতে গিয়া তাঁহার পুতুল-সংগ্রহটি দেখিয়াছিলাম। শিশু-সুলভ আনন্দের সহিত আমাকে পুতুলের পর পুতুল দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন তিনি। মনে হইয়াছিল যেন এক প্রৌঢ় শিশুর খেলাঘরে বসিয়া আছি।

আরও কয়েকটি কারণে তাঁহাকে ভালো লাগিত। সেগুলি কিন্তু গুণ নহে, দোষ। তিনি খুব আড্ডাবাজ লোক ছিলেন, পরনিন্দা পরচর্চা করিতেন। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলিতেন যাহা প্রকাশ্যে বলা যায় না। অনেক বড়লোকের হাঁড়ির খবর রাখিতেন তিনি। সেগুলি মাঝে মাঝে নিম্নকণ্ঠে বলিতেনও। কোনও সভায় তাঁহার কাছে বসিলে কানের কাছে ফিস ফিস করিয়া নানারকম গল্প বলিতেন। নিজে যখন সভায় বক্তৃতা দিতেন তখন বক্তৃতার প্রসঙ্গ হইতে প্রায়ই দূরে সরিয়া যাইতেন। বক্তৃতার বিষয় হয়তো বঙ্গ-সংস্কৃতি, কতক মিনিট পরেই দেখা যাইত তিনি গ্রীক নাটক লইয়া মনোরম বক্তৃতা করিতেছেন। সে বক্তৃতা বিষয়-বহির্ভূত হইলেও শুনিতে খুব ভালো লাগিত। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেন সে বক্তৃতা। ছোট নদীর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি সাগর-মহাসাগরে অনায়াসে

চলিয়া যাইতে পারিতেন, তাঁহার জ্ঞানের পরিধি এত বড় ছিল। বক্তৃতা করিতে শুরু করিলে তাঁহার সময়ের জ্ঞান থাকিত না। ইহা বক্তৃতার গুণ নহে, দোষ। কিন্তু এই জন্যই তাঁহাকে ভালো লাগিত।

তাঁহাকে ভালো লাগিত আর একটা কারণে। তিনি খাদ্যরসিক ছিলেন এবং যে কোনও খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাইয়া হজম করিতে পারিতেন। বাংলা-সাহিত্য-সংসারের দাদামশাই স্বর্গীয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অশীতি-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে আমরা চল্লিশ জন সাহিত্যিক তাঁহার পূর্ণিয়ার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পূর্ণিয়া যাইবার পথে আমার বাড়িতে মণিহারীতে, সাহিত্যিকরা একদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সুনীতিবাবুও ছিলেন। খাওয়ার আয়োজন হইয়াছিল বাঙালী রীতিতে। কম্বলের আসন, কলাপাতা এবং ছোট বড় মাটির খুরি। নিরামিষ নানারকম তরকারি, কিছু ভাত, মাংসের কোর্মা, বিরিয়ানি, মাছ ভাজা, মাছের কালিয়া, মাছের অম্বল, পায়েস এবং দই। আমি ও আমার ভাইরা পরিবেশন করিতেছিলাম, আমার বাবা প্রত্যেক অতিথির পাতের কাছে গিয়া দেখিতেছিলেন কাহার কি লাগিবে। সুনীতিবাবু বিরিয়ানি এবং কোর্মা দুইবার চাহিয়া লইলেন। তখন বাবা বলিলেন—একটি বড় রুই মাছের গোটা মুড়া আলাদা রান্না করা হইয়াছে, সেটি কি আপনাকে আনিয়া দিব? সুনীতিবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—দিন। সে মুড়োটির তিনি সদ্গতি করিলেন। এই সে দিন, মাত্র পাঁচ বৎসর আগে, তিনি আমার ছোট ছেলের বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইয়া গিয়াছিলেন আমার কলিকাতার বাড়িতে। তখনও বিরিয়ানি, ভেট্‌কি মাছের ফ্রাই এবং মিষ্টান্ন বারবার চাহিয়া লইয়া যে প্রাণোচ্ছলতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ। তিনি প্রচুর কঠিন কঠিন ভাষা হজম করিয়াছিলেন, প্রচুর খাদ্য হজম করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল। অতি-ভোজন গুণ নয়, দোষ। কিন্তু এই জন্যই তাঁহাকে ভালোবাসিতাম, শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার দেহ বেশ বলিষ্ঠ ছিল, মনও বেশ বলিষ্ঠ, শিশুসুলভ নানা কৌতূহলে তিনি মশগুল হইয়া থাকিতেন। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার আগ্রহই তাঁহাকে সংস্কারমুক্ত করিয়াছিল। তাঁহার আর একটি দোষ, নিজের প্রিয় ছাত্রদের সম্বন্ধে পক্ষপাত। অসংখ্য ছাত্র তাঁহার, তাঁহারাও বিরাট একটি নক্ষত্র-মণ্ডলের মতো সমুজ্জ্বল। সুনীতিকুমার এই গর্বে সদা গর্বিত থাকিতেন এবং তাঁহাদের উন্নতির জন্য পক্ষপাতিত্ব করিতেও দ্বিধা করিতেন না।

তাঁহার বিশাল মনীষা জ্ঞানের জন্য তাঁহাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সেই মনীষী জ্ঞানী ব্যক্তিটি আমার নাগালের বাহিরে। যে লোকটিকে নাগালের মধ্যে পাইয়াছিলাম তাঁহাকে ভালো লাগিত তাঁহার নানাবিধ মানবিক দোষগুণের জন্য- ঠিক যে জন্য ভালো লাগে দুরন্ত দামাল প্রাণবন্ত শিশুকে।

পণ্ডিতের পরিচয় পুস্তকেরা বহিবে গৌরবে
শিশুটির পরিচয় বল কোথা রবে?

তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমার প্রণাম নিবেদন করিতেছি—

## প্রণাম

অতিক্রমি বহু বাধা তুচ্ছ করি ভয়
সারস্বত মন্দিরের সোপান নিচয়
সগৌরবে পার হয়ে শীর্ষদেশে তার
উঠেছিলে অবশেষে। সম্মান-সম্ভার
স্তূপীকৃত হয়েছিল ঘিরিয়া তোমারে
জ্ঞান-বৃদ্ধ হে তাপস অন্তর মাঝারে
শিশু-সম ছিলে তবু, মুখের হাসিতে
রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুকের আনন্দ রাশিতে
রেখে গেছ তার পরিচয়। বহু দেশ
করেছ ভ্রমণ, পরিয়াছ বহু বেশ
শিখিয়াছ বহু ভাষা কিন্তু মনে মনে
খাঁটি বাঙালীই ছিলে, স্বপ্নে জাগরণে
বাঙালীর হিত-চিন্তা করিয়াছ তুমি
পবিত্র তোমার কুল ধন্য জন্মভূমি।
নভশ্চুম্বী কীর্তি তব মহিমা অপার
তোমারে প্রণাম করি সুনীতিকুমার। *

*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঁচাশিতম প্রতিষ্ঠাদিবসে, ৮ শ্রাবণ, ২৪ জুলাই ১৯৭৭, পরিষদ্ মন্দিরে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত॥

# ভারতীয় ভাষাসমীক্ষার ইতিহাস

## শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার

১. ভ

ভারতীয় ভাষার আলোচনা প্রকৃতপক্ষে ভাষাতত্ত্বের উদ্বোধন দিয়েই শুরু। ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাতও এই ভারতে সর্বপ্রথম ঘটেছিলো। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে ইংরাজি ১৭৮৬ সাল একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই সময় Sir William Jones কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধনী ভাষণে (ফেব্রুআরি ২, ১৭৮৬) সর্বপ্রথম সংস্কৃত, গ্রীক ও লাটিনের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেন: "The *Sanscrit* Language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong indeed, that no philologer could examine all three without believing them to have sprung from some common source which perhaps no longer exists."

Jones-এর অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরপর অনেকেই সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষাগুলির ঐতিহাসিক আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন, কিন্তু ভারতে ভাষাসম্পর্কে নতুন কিছু রচনা আর প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘদিন বাদে ১৮৫৬ সালে Bishop Caldwell-এর (১৮১৪-৯১) বিখ্যাত গ্রন্থ "The Comparative Grammar of the Dravidian of South Indian Family of languages" প্রকাশিত হলে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের নবদিগন্ত সূচিত হলো। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থ এখনও একখানি আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে আদৃত হয়ে থাকে। যাই হোক, এর কয়েক বছর বাদে ১৮৬৬ সালে ঠিক এইরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে John Beames ভারতীয় আর্যভাষা গবেষণার সূত্রপাত করলেন। ১৮৬৬ সালে 'A Comparative Grammar of the Modern Indian Languages' গ্রন্থখানি রচিত হলেও তিন খণ্ডের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হলো ১৮৭২ সালে। এর পর J. Beames তাঁর গ্রন্থটি সমাপ্ত করলেন তিন খণ্ডে এই নামে: A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages, London, 1872 (I), 1875 (II), 1879 (III)। তাঁর অপর বিখ্যাত ক্ষুদ্র পুস্তক 'Outlines of Indian Philology' প্রকাশিত হয়েছিলো অবশ্য উপরি-উক্ত গ্রন্থের পূর্বে (ইং ১৮৬৭)। ১৮৭২ সালেই Rudolf Hoernle (১৮৪১-

১৯১৮) তাঁর গবেষণার প্রথম অংশটি প্রকাশ করলেন Journal of the Asiatic Society of Bengal-এ এবং পরে তা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হলো ১৮৮০ সালে:

১. Essays in aid of the Comparative Grammar of the Gaudian Languages, JASB, Vol. XLI, Part I, 1872, p 120; Vol. XLII, Part 1, 1873, p. 59; Vol. XLIII, Part I, 1874, p. 22.

২. A Grammar of the Eastern Hindi compared with the other Gaudian Languages, London, 1880.

বস্তুত গ্রীয়ার্সনের Linguistic Survey of India (LSI) গ্রন্থে অনুসৃত আর্যভাষা বর্গীকরণের সূত্রগুলি এইখানেই সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হলো।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে এই শতকের আরও কয়েকজন বিখ্যাত গ্রন্থকারের রচনা-তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

১. Ernest Trumpp: (ক) Grammar of the Sindhi Language compared with Sanskrit, Prakrit and the cognate Indian Vernaculars, 1872 (গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে ব্যুৎপত্তিমূলক ব্যাকরণ). (খ) Pashto Grammar, 1873.

২. John Platts: Grammar of Hindustani or Urdu Language, 1872 (ব্যুৎপত্তিমূলক ব্যাকরণ)।

৩. Frederick Drew: The Jamoo and Kashmir, 1875 (গ্রন্থখানিতে জম্মু ও কাশ্মীরের ১৩টি প্রধান ভাষা/উপভাষা আলোচিত হয়েছে).

৪. S. H. Kellogg: A Grammar of the Hindi Language, 1876 (বিষয়: হিন্দীভাষা ও তার উপভাষার বিবরণ).

৫. R. G. Bhandarkar: Wilson Philological Lectures, 1877, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 16, 17 (1883-85, 1887-89), (বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ। উপজীব্য: সংস্কৃত ভাষা থেকে আধুনিক ভাষার বিবর্তনগত ইতিহাস).

৬. R. N. Cust: A Sketch of Modern Languages of the East Indies, 1878 (গ্রন্থটি East Indies-এর ভাষাসমীক্ষা, কিন্তু সেইসঙ্গে ভারতীয় আর্যভাষা বর্গীকরণের নতুন মানদণ্ড স্থাপিত হয়েছে। গ্রীয়ার্সন Cust-এর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন).

উপরি-উক্ত লেখক ও তাঁদের রচনাবলী ছাড়াও আরো কিছু কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত আধুনিক ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন, যেমন—B. H. Hodgson, Rev. W. Robinson, Prof. Max Müller, George

Campbell, W. W. Hunter, L. D. Skrefsrud, E. T. Dalton ইত্যাদি।

২. ভারতীয় ভাষা এবং জনসমীক্ষা ঃ

ভারতীয় জনসমীক্ষার প্রথম সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষ পাদে। কিন্তু যে নিবন্ধে ভারতের ভাষাসমীক্ষার একটি উপযোগী আদর্শ সর্বপ্রথম তুলে ধরা হয়েছে, সেটি হলো Sir Erskine Perry-রচিত "On the Geographical Distribution of the Principal Languages of India and the feasibility of introducing English as a *lingua franca*, প্রকাশিত Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 1853।

সারা ভারতের মাতৃভাষা-সমীক্ষার প্রথম সূত্রপাত অবশ্য ১৮৮১ সালে। এই সমীক্ষায় কিন্তু কাশ্মীর এবং কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এই সমীক্ষায় ভাষার মূল্যায়ন ছিল খানিকটা গৌণ। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো বক্তার মাতৃভূমি (Birth place), জাতি (Race), স্বাজাত্য (Nationality) অথবা নৃতাত্ত্বিক সংবাদ পরিবেশন।

১৮৮১-সমীক্ষার পূর্বে অবশ্য আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কিছু কিছু লাভ করা গিয়েছিলো, যেমন, বোম্বাই (১৮৬৪), মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি (১৮৭১) এবং বাঙলা (১৮৭২)। তবে ভাষা-ভাষীর সংখ্যা, ভাষাঞ্চল, এমনকি ভাষাতাত্ত্বিক সাধর্ম্য ইত্যাদি সম্পর্কে মুখ্য অথবা গৌণ উল্লেখ এই সমীক্ষায় থাকলেও তা গভীরভাবে অনুশীলনযোগ্য হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, ১৮৮১ সনের এই জনসমীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ কেউ ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা শুরু করে দিলেন। এগুলি প্রধানত পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অথবা বাঙলার জনসমীক্ষা, যেমন—

Ibbetson D. C. J.: Report on the Census of the Panjab taken on the 17th February, 1881, Vol. I, Chapter V.

White E.: Report on the Census of the North-western Provinces and Oudh taken on the 17th February, 1881, Section XV.

McIver L.: Imperial Census of 1881. Operations and Results in the Presidency of Madras, Chapter X.

Bourdillon J. A.: Census of Bengal, 1881 (Report), Vol. I. Chapter X.

এই সমস্ত বিবরণী সংক্ষিপ্ত হলেও সংবেদকেরা সমকালীন ভাষাতাত্ত্বিক রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; তাই Caldwell, Hoernle, Beames, Max Müller, Cust প্রভৃতি ভাষাবিদ্‌দের মতামত তাঁরা সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেননি।

ভারতীয় জনসংখ্যার দ্বিতীয় সমীক্ষা পরিচালিত হলো আরও দশ বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৯১ সালে। এই সমীক্ষার সরকারী উদ্দেশ্য ছিল জনগণনা কিন্তু সেই সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার অনুধাবন ("to serve as an aid to future philological inquiry": Baines J. A., Census of India, 1891, General Report, p. 130), পূর্ব-অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী কেবল race অথবা nationality-র বিচার নয়। এর ফলে ভারতীয় ভাষাগুলির প্রচলিত পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের যথার্থ মৌলিক সম্বন্ধ নির্ণয় অপরিহার্য হয়ে উঠলো ("to collect parent tongue information and compare the same with accepted scientific nomenclature," p. 131)। এই গবেষণা-কর্মের পরিচালন-পদ্ধতি প্রসঙ্গে Baines স্মরণ করিয়ে দিলেন: "An operation of that description can only be conducted by a skilled philologist who knows exactly the lines on which information should be collected, so that the results may be susceptible of comparison over the whole of India. It is hardly necessary to add that he must have a practical knowledge too, of the country and its inhabitants and should not work from books alone. Then again, an enquiry of this sort should be commenced, if taken in hand at all, without further delay." (p. 131) । বলা বাহুল্য, Baines-এর পরামর্শ-বাণী ভাষাসমীক্ষার ক্ষেত্রে এখনও প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, সরকারী পরিচালকদের তুলনায় ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজনীয়, তা Baines তাঁর অন্তর্জ্ঞান দিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন।

এর পরের দশকের ভাষাসমীক্ষা পরিচালিত হলো ১৯০১ সালে। এই ভাষাসমীক্ষার (Linguistic Survey) পরিচালক বা Superintendent ছিলেন Sir George A. Grierson। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী সমীক্ষাগুলির সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ করেননি। এই সমীক্ষায় অনুসৃত তাঁর ভাষা-বর্গীকরণের সূত্র পরবর্তীকালে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ভাষা-সমীক্ষার মূল ভিত্তি ছিল।

১৯০১-সমীক্ষার পরে ১৯২১ সালে যে জনসমীক্ষা হয়েছিলো তার পরিচয় মেলে Martin-এর বিবরণে (দ্র. Martin, J. J.: Census of India, 1921, Vol. I, Part 1, Report, Chapter IX, p. 192)।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে জনসমীক্ষার শেষ পর্ব হলো ১৯৩১ সাল এবং বলাবাহুল্য তা গ্রীয়ার্সন-অনুসৃত পথেই পরিচালিত হয়েছিল। এই সমীক্ষার পরিচালক ছিলেন Hutton (দ্র. Hutton, J. H.: Census of India, 1931, Vol. 1 Part i, Report, Chapter X.)

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে আশা করি, পরিস্ফুট হয়েছে, ভারতীয় জনগণনা বা

Census এবং ভাষাসমীক্ষা ( Linguistic Survey ) প্রকৃতপক্ষে পরিপূরক সমীক্ষারূপে আগাগোড়া পরিচালিত হয়েছিল।

৩. জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন ( ১৮৫১—১৯৪১ ):

গ্রীয়ার্সনের পরিকল্পনায় ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাসমীক্ষা এক চমৎকার সুসংহত আদর্শ সৃষ্টি করেছিল। তাই তাঁর পরিকল্পিত LSI গ্রন্থখানি আজও অমর। সুতরাং ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে গ্রীয়ার্সন সম্পর্কীয় তথ্যগুলি জানা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। Sir George Abraham Grierson ১৮৫১ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (ICS) পরীক্ষায় কৃতবিদ্য হয়ে তিনি বাঙলা প্রেসিডেন্সিতে চাকরিসূত্রে আসেন। একাদিক্রমে ২৩ বছর তিনি কর্মজীবনের দায়িত্বভার বহন করেন। পরে ১৮৯৮ সালে তিনি LSI যোজনার পরিচালক ( Superintendent ) নির্বাচিত হন। ১৮৭৪ সাল থেকে তিনি ক্রমান্বয়ে ভারতীয় লোককথা, সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে অবিশ্রান্তভাবে লেখনী চালনা করেন। এই শতকের আট দশকে বিহারে স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় বিহারী ভাষাগুলি সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ সম্মেলনের (Congress of Orientalist ) ভিয়েনা অধিবেশনে (১৮৮৬) Buhler, Weber, Cust, M. Williams এবং অন্যান্যদের সহায়তায় তিনি ভারতীয় ভাষাসমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রস্তাব অনুমোদন করান। এই কাজ শুরু হয় ১৮৯৮ সালে। ১৯০৩ সাল থেকে LSI খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে এবং শেষ খণ্ড বেরোয় ১৯২৭ সালে। এই বিপুল গ্রন্থ ১১টি Octavo Volume-এ গ্রথিত। তার মধ্যে ৫টি খণ্ড ১৪টি অংশে বিভক্ত। এতে ভারতে প্রচলিত ১৭৯টি ভাষা এবং ৫৪৪টি উপভাষার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সমস্ত গ্রন্থই সম্পাদনা করেন গ্রীয়ার্সন নিজে। ১৯০৩ সালে তিনি সরকারী কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে ইংলণ্ডে ফিরে যান। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ হলো—

১. An Introduction to the Maithili Languages of North Bihar, Asiatic Society of Bengal, 1881-82.
২. Seven Grammars of the Dialects and Sub-dialects of the Bihari Language (8 parts), 1883-87.
৩. Bihar Peasant Life, Calcutta, 1885.
৪. Padumavati of Jaisi ( in Collaboration with Sudhakar Dwibedi ), 1876.
৫. Modern Vernacular Literature of Hindustan, JASB, 1889.
৬. Translation of Emile Senart's 'The Inscriptions of Piyadasi', Indian Antiquary, 1888.

৭. On the Phonology of the Modern Indo-Arian Vernaculars, ZDMG, 1895-96.
৮. Essays on Kashmiri Grammar, Calcutta/London, 1899.
৯. A Manual of the Kashmiri Language (2 parts), Oxford, 1911.
১০. A Dictionary of the Kasmiri Language, 1916-32. ইত্যাদি।

দীর্ঘদিন ভারতীয় ভাষাসম্পর্কে গবেষণা করার ফলে এই ভাষাগুলি সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে। ভারতীয় তথা এশীয় ভাষাগুলির গোত্রগত সম্পর্ক নির্ণয় ও ভাষাসমীক্ষা ছাড়াও তাঁর উদ্ভাবিত বিশেষ কতকগুলি তত্ত্ব এবং অবদান দেখা যাবে এই এই ক্ষেত্রে: ভারতীয় ভাষার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বর্গীকরণ (Inner and Outer Circle Theory), পশ্চিমা হিন্দুস্থানী ও বিহারী ভাষাগুলির সঠিক মূল্যায়ন, দর্দ্ গোষ্ঠীভুক্ত আর্যভাষা, বিশেষত কাশ্মীরী ভাষার স্বরূপ নির্ণয়, জিপসী ভাষা সম্পর্কে তথ্যাবলী আহরণ ইত্যাদি।

৫. গ্রীয়ার্স'ন ও Linguistic Survey of India (LSI):

গ্রীয়ার্সন-পরিচালিত ভাষাসমীক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল: একটি আদর্শ পাঠ অবলম্বনে জ্ঞাত কথ্য ভাষাগুলির অনূদিত নমুনা সংগ্রহ এবং সেই সঙ্গে কিছু শব্দ ও বাক্যের তালিকা প্রস্তুতকরণ। "(Collection of specimens of every known speech through the translation of a standardized running text and the listing of words and sentences)।" কিন্তু এই ভাষাগুলির বর্গীকরণের জন্য প্রয়োজন একটি সুসংহত পদ্ধতি। গ্রীয়ার্সনের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ব্যাকরণের সাহায্যে তাদের শ্রেণীভুক্ত করা (LSI, vol. I, part i, p. 22)। ভাষাসমীক্ষার প্রাথমিক ধ্যানধারণা অনুযায়ী তিনি কেবল শব্দভাণ্ডারকেই একমাত্র অবলম্বন মনে করেননি। দ্বিতীয়তঃ, তুলনীয় বিভিন্ন ভাষাগুলি বক্তাদের কাছে কতখানি বোধগম্য, তা মানদণ্ড না ক'রে তিনি প্রচলিত ব্যাকরণ-গত কাঠামোর ওপরই জোর দিতে চেয়েছিলেন বেশি। ফলে তাঁর সমীক্ষা কিছুটা Subjective হয়ে উঠেছে। তৃতীয়তঃ, ভাষার সাহায্যে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করাও তাঁর পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য (motif)। তিনি মনে করতেন, ভাষা-পরিকল্পিত জাতীয়তাবোধ ভাষাভাষীদের ভাষা সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী করে তুলবে এবং তার ফলে সেই ভাষা সৃজনশীল হয়ে উঠবে আগামী দিনের সৃষ্টি-সম্ভাবনায় (P. 24)। চতুর্থতঃ, তাঁর বর্গীকরণ প্রধানত গোত্রগত বর্গীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বর্গীকরণের ক্ষুদ্রতম একক হলো Sub-dialect এবং বৃহত্তম একক Family এবং এদের অন্তর্বর্তী ক্রম হলো এইরূপ: Sub-dialect (বিভাষা)—→Dialect (উপভাষা)—→Language (ভাষা)—→Group (বিভাগ/বর্গ)—→Sub-branch (প্রশাখা)—→শাখা (Branch)—→Sub-family (উপগোষ্ঠী)—→Family (গোষ্ঠী)। গ্রীয়ার্সন-সমীক্ষার গোত্রগত বিচারে

ভারতের ভাষাগোষ্ঠী সংখ্যায় ছয়টি, যথা— অস্ট্রিক ( Austric ), কারেন (Karen), মোন্ (Mon), ভোট-বর্মী ( Tibeto-Burman), দ্রাবিড় (Dravidian) এবং ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European)।

একথা অনস্বীকার্য, গ্রীয়ার্সনের সমীক্ষা সর্বতোভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। গ্রীয়ার্সন নিজেও অনেক সময় তাঁর রচনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই প্রসঙ্গে LSI গ্রন্থের কয়েকটি অসম্পূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে :

১. এই সমীক্ষা থেকে মাদ্রাজ, ব্রহ্ম, হায়দ্রাবাদের রাজ্যগুলি এবং মহীশূর রাজ্য বাদ পড়েছিল।

২. আলোচ্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রে ধ্বনিবিজ্ঞান বা phonetics-এর আলোচনা নেই। অবশ্য এইসময় ধ্বনিবিজ্ঞান ছিল শৈশব স্তরেই। ফলে ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক বা Phonetician সংগ্রহ করা অসম্ভবপ্রায় ছিল।

৩. সমীক্ষার 'উপাদানগুলি' সমীক্ষা-সম্পাদকের কাছে প্রেরিত হয়েছিল আর এদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছিলেন সরকারী কর্মচারীরা। এঁরা যথার্থ যোগ্য (Uniformly competent) এবং পারদর্শী (qualified) ছিলেন কিনা এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

৪. নমুনা-সংগ্রহের উপাদান ছিল প্রচুর, কয়েক হাজার তো বটেই। গ্রীয়ার্সন তাই এইগুলিকে ঝাড়াই-বাছাই বা পরিশোধন করেছিলেন তাঁর নিজের আদর্শ অনুযায়ী ( আর এই আদর্শও ছিল subjective এবং তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, দ্র. LSI vol. I, Part i, p. 197)। তিনি নিজেই অনেকক্ষেত্রে ( বিশেষত ভোট-বর্মী, অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে ) মন্তব্য করেছেন যে উপাদানগুলির কিছু কিছু অংশ অবিশ্বাসযোগ্য ('untrustworthy'). অসন্তোষজনক ('unsatisfactory') অথবা স্বল্প উদাহৃত ('very meagre, insufficient') বা বিতর্কিত ( 'to be taken with reserve ) ইত্যাদি।

স্পষ্টতই LSI সমীক্ষায় গ্রীয়ার্সন কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সে সম্পর্কে তিনি নিজেও যথেষ্ট অবহিত ছিলেন ( দ্র. LSI vol. I, part i, p194 )। পরবর্তী যুগে স্বভাবতই এই সমীক্ষা আরও যথার্থ ও সুবিন্যস্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাতে গ্রীয়ার্সনের অবদান বাতিল হয়ে যেতে পারে না। বর্তমানে কোন কোন নব্য পণ্ডিত গ্রীয়ার্সনের এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে বক্রদৃষ্টিতে দেখেছেন, যদিও LSI ভাষাসমীক্ষার মতো এমন স্থাপত্যশিল্প এখনও কোনও দেশে দেখা যায়নি। Prof. Jules Bloch বলেন : "No other large portion of earth can boast of any so extensive and methodologically uniform description as the one you see collected in the volumes

of the linguistic survey of India. That will long give you a basis and a frame to linguistic Studies in India." (দ্র. Some problems of Indo-Aryan Philology, Forlong lectures for 1929, Bulletin of the School of Oriental Studies, London, vol. V. (928-30), pp. (750-51)।

বলা বাহুল্য এই উক্তি তাৎক্ষণিক প্রশংসা নয়, কারণ, বর্তমানেও Prof. M. B. Emeneau-র মতো সুধীজন বর্ণনামূলক অথবা তৌলন ভাষাতত্ত্বের পক্ষে LSI সংবেদন অপর্যাপ্ত (inadequate) ব'লে মনে করলেও, গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "Yet an amasing amount of the gross features come through and the survey does roughly map out language and dialect areas which can be visited to produce more adequate treatment." [Presidential Address: American Oriental Society at Toronto on April 20, 1955, published in Journal of the American Oriental Society, vol. 75, No. 3 (July—Sept.), 1955, p. 152 ]।

সম্প্রতি J. J. Gumperz এবং C. A. Ferguson LSI সম্পর্কে যে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, এই প্রসঙ্গে তাও উল্লেখযোগ্য : "Almost all the work in South-Asian dialectology published since Grierson has been based on his work with only a very megre amount of original investigation and Grierson's volume remains by far the most inportant source of data for the social scientist concerned with the distribution of dialect diversity of South-Asian Languages." একই গ্রন্থের অন্যত্র তাঁরা বলেছেন : "...in nothing that Grierson did little or no dialect at last work, we have no intension of belitting his tremendous achievement. The LSI remains one of the world's major productions of linguistic scholarship and Grierson himself was aware of the necessary limitation of his project" [ Linguistic Diversity in South Asia, 1960, pp. 8, 18]।

গ্রীয়ার্সন সম্পর্কে উপরি-উক্ত প্রশংসাবাক্যগুলি উদ্ধৃতির একমাত্র কারণ এই যে সাম্প্রতিক ভাষাসমীক্ষার (১৯৬১) ক্ষেত্রেও গ্রীয়ার্সনের এই বর্গীকরণ পদ্ধতি গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই গ্রীয়ার্সন-সমীক্ষার দোষ-গুণ বর্তমান সমীক্ষায়ও বর্তেছে।

৫, সাম্প্রতিক ভাষাসমীক্ষা : ১৯৬১—১৯৭১ :

পূর্বেই বলেছি, সাম্প্রতিক ভাষাসমীক্ষার মূল প্রতিশ্রুতি গ্রীয়ার্সন-বর্গীকরণকেই অঙ্গীকার করে নিয়েছে। কোথায়ও কোথায়ও অবশ্য কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, যেমন, এই পরিসংখ্যানে অথবা ১৯৫১-সমীক্ষায় হিন্দী ভাষাঞ্চলকে একটি বিশাল অবয়বে প্রসারিত করার চেষ্টা দেখা গেছে।

দ্বিতীয়ত, সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করেছেন ক্ষেত্রবিশেষজ্ঞদল (Field workers)। বর্তমান সমীক্ষা প্রশ্নোত্তরমালার ( Questionnaire ) আকারে রচিত। প্রত্যেক নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল দুটি প্রশ্ন : প্রথমত বক্তার (Enumerator) মাতৃভাষা কী এবং দ্বিতীয়ত বক্তা অন্য ভাষা জানে কিনা। মোট কথা মাতৃভাষা (mother tongue ) ও দ্বিভাষীর সংখ্যা ( Bi-lingual returns ) নিরূপণ ছিল এই পরিসংখ্যানের মূল উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, সমীক্ষা, পরিচালক কার্যসাধন প্রণালীর ( modus operandi ) সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আমাদের অবহিত করেছেন। এই জাতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধান অসুবিধা নানা ধরনের হতে পারে, যেমন—

১. সাধারণভাবে প্রত্যেক বক্তাই তার মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু শহরাঞ্চলে ভাষাভাষীদের মিশ্রণের ফলে বিপর্যয় ঘটতে পারে, যেমন, দিল্লীতে বসবাসকারী দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাভাষী প্রশ্নোত্তরে জানায়, তার মাতৃভাষা মাদ্রাজী ( অর্থাৎ তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্ বা কানাড়ীর পরিবর্তে )।

২. মাতৃভাষার ইংরাজী প্রতিবর্ণীকরণেও ( Roman Transcription ) কিছু ভুল থেকে যেতে পারে।

৩. একই রাজ্যের মধ্যে অথবা অন্য রাজ্যে একই মাতৃভাষা বিভিন্ন নামে অথবা বানানে প্রচলিত, যেমন,—লুসাই/লুশেই/মিজো, মোঘ/মঘি, সৌরাষ্ট্র/সৌরাষ্ট্রী ইত্যাদি।

৪. অনেক সময় একই ভাষা বিভিন্ন উচ্চারণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যেমন—বিরজিয়া/ব্রিজিয়া/বিঞ্জিয়, বোডো/বোরো, ব্রজভাষা/ব্রজভাখা, দকনী/মুসলমানী, খোন্দ/কোন্দ, ইত্যাদি। বিদেশী ভাষাগুলি সম্পর্কেও এইরূপ বিপর্যয় সহজলভ্য, যথা—আফগানী/কাবুলী/পখ্‌তো/পশ্‌তো/পাঠানী ইত্যাদি।

৫. বিপরীত পক্ষে বিভিন্ন ভাষাকে একই ভাষারূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা যায় ; যেমন, 'হিন্দী' ভাষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় তা বিভিন্ন নামে চিহ্নিত : হিন্দী/হিন্দুস্থানী/নাগরী/নাগরী হিন্দী/পছাহাঁ (?) ইত্যাদি।

৬. গ্রীয়ার্সন নির্ধারিত বানান অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তিত করা হয়েছে, যেমন গ্রীয়ার্সনের 'ওরাওঁ' এখানে হয়েছে Oran বা ওরান।

৭. বহুক্ষেত্রে মাতৃভাষীর সংখ্যা দু/একজন মাত্র। এছাড়া অনির্ণীত (unspecified) বা সংকর ( hybrid ) ভাষাগুলির সমস্যা তো আছেই।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকেই বোঝা গেলো, বর্তমান ভাষাসমীক্ষার মূল সমস্যা কোথায়। জটিল বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বরং বর্তমান ভাষাসমীক্ষার পরিচালন-পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয়, বর্তমান পরিসংখ্যান থেকে কেবল মাতৃভাষার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা যাচ্ছে, ভাষার উপভাষা বা বিভাষার পরিচয় নয়। প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষার সংজ্ঞা কী তা জানা নেই। ভারতের বিপুল

নিরক্ষর জনগণকে ( প্রায় ৭০% ) যখন তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তাদের কাছ থেকে আমরা কী উত্তর আশা করতে পারি? বর্তমান সমীক্ষণেই দেখা গেছে, বহু নাগরিক তাদের মাতৃভাষাকে নিজেদের উপজাতিক ( tribal ) নামে অভিহিত করেছেন, ( যেমন, বঞ্জারী, আদিবাসী ভীলী, রাজবংশী, আদি গোণ্ডী ইত্যাদি ), কখনও বা প্রচলিত ধর্মীয় অভিধায় ভাষাকে চিহ্নিত করেছেন ( ইসলামী, মুসলমানী, শিখী, পার্শী ইত্যাদি ), এমনকি লিপিরীতিকেই ভাষা নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন ( যেমন, নাগরী )। এমনও দেখা গেছে, নিজের জন্মভূমিকেই ভাষা বলে মনে করেছেন বহু বক্তা ( পাকিস্তানী, মাদ্রাজী ) অথবা নিজের বৃত্তিকে ভাষা ব'লে ভুল করেছেন ( ক্ষত্রী, ক্ষত্রীয় মারাঠী, রাজপুতী, অহীর হিন্দী, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি )। এছাড়া মাতৃভাষা মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত হওয়ায় মাত্র দু / তিনজন কথা ব'লে—এমন মাতৃভাষাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং বক্তার ইচ্ছায় ভাষা চিহ্নিত হলে তা সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত ভাষাসমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ভাষা-উপভাষা-বিভাষার স্পষ্ট বিভাজন (delimitation), কেবল ভাষাভাষীর পরিসংখ্যান যেখানে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। এই সমীক্ষার মূল ত্রুটি হলো ব্যাকরণগত বিচারে ভাষাগুলিকে চিহ্নিত করা হলেও ব্যক্তিগত স্তরে মাতৃভাষাকে সেই আলোকে বিচার না ক'রে বক্তার ইচ্ছার ওপর ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং ভাষার delimitation-এর জন্ম প্রয়োজন ভাষাবিভেদের ভৌগোলিক জরিপ ( dialectal atlas )। ভাষার সীমানা চিহ্নিত না ক'রে মাতৃভাষার পরিসংখ্যান নেওয়া এবং সেইসঙ্গে সেই ভাষাটিকে নির্বিচারে যে কোন ভাষা বা উপভাষার এক্তিয়ারে বর্গীভূত করা অনেক সময় সঠিক নাও হতে পারে। অথবা বিপরীত দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, আগে বক্তাদের ভাষাগুলির পরিপূর্ণ চিত্র গ্রহণ করা দরকার, তারপর আসে ভাষাগুলির ভাষাগত সীমানা নির্ধারণ।

তৃতীয়ত, মাতৃভাষার সংখ্যাধিক্য দিয়ে যেমন ভাষিক বা উপভাষিক মর্যাদা (dialectal status ) নির্ণয় করা যায় না, তেমনি কোন ভাষার জনবল-পরিসংখ্যান দিয়ে সেই ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১-সমীক্ষায় প্রদর্শিত পরিসংখ্যানের সাহায্যে হিন্দীর গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, কারণ ১৯৬১-জনগণনায় হিন্দী সারা ভারতের আনুমানিক ৩০·৩৭% জনগণের ভাষা ( ১৯৫১-জনগণনায় উর্দু-হিন্দুস্থানী-পাঞ্জাবীকে অন্তর্গত করে হিন্দীর হার দেখানো হয়েছিল ( ৪২·০১% )। কিন্তু জনগণের সংখ্যাধিক্যই যদি কোন ভাষার গুরুত্বের মাপকাঠি ব'লে ধরা হয়, তাহলে ভারতে অ-হিন্দী ভাষাভাষীর বাকী ৭০% জনগণের ভাষাকে উপেক্ষা করা হয়। সাহিত্যিক মর্যাদার দিক দিয়েও বাঙলা, তামিল ও মারাঠীর পরে হিন্দীর স্থান। শুধু তাই নয়, ভারতীয় জনগণের মাত্র ২·৫% অংশ ইংরাজী জানে বা বোঝে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ইংরাজীর গুরুত্ব কি কোন অংশে কম? লক্ষণীয়, ১৯৬৬ সনের হিসাব অনুযায়ী ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট

প্রচার-সংখ্যার ২৫·৩% কিন্তু হিন্দীর ক্ষেত্রে ১৩%। [দ্র. Jyotirindra Das Gupta : Language Conflict and National Development, California, 1970]। এই প্রসঙ্গে কোন ভাষার অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কথাও ভেবে দেখা দরকার। সমগ্র হিন্দী ভাষাঞ্চলে (অর্থাৎ বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ-রাজস্থান) স্বাক্ষর লোকের গড় হার ১৭·৭% কিন্তু অহিন্দী ভাষাঞ্চলে এই হার ২৭·১% (Census of India, Paper no. 1 of 1962, p. xxxii)।

চতুর্থত, যদিও এই সমীক্ষায় দ্বিভাষী জনগণের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ভারতে এক-ভাষাভাষীদেরই প্রাধান্য বেশি, যেমন ১৯৬১ সনের গণনা অনুযায়ী প্রায় ৪৪ কোটি লোকের মধ্যে ৩ কোটি লোক দ্বিভাষী (Bi-lingual) (লিখতে পড়তে বা বুঝতে পারার স্বচ্ছন্দতার কথা বাদ দিয়েই)। প্রকৃতপক্ষে যারা ভারতে দুটি ভাষা জানে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা ৭%-এর বেশি নয়, তাছাড়া দ্বিভাষীদের কেবল হার-নির্ণয়ই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত : দ্বিভাষপ্রবণতার পরিবেশগত পরিস্থিতি, সামাজিক যোগাযোগজনিত প্রভাব, দ্বিতীয় ভাষাটির উপর মাতৃভাষার প্রকৃত অধিকার (degree of control) অথবা দুটি ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোধগম্যতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা। Charles A. Ferguson-এর মতে উপাদান-সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত : "When and under what circumstances each language is used and what the attitudes of the people are toward the two languages" [Background to Second language problems in "Study of the role of second language in Asia, Africa and Latin America, edited Frank A. Rice, p. 2]।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে বর্তমান সমীক্ষার অসম্পূর্ণতার কথা বোঝা গেল। কোন গৃহকর্তার দায়দায়িত্বের কথা বাদ দিয়ে তার আয়ের অঙ্কেই যদি গৃহস্থের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ব'লে স্থির করা হয়, তাহলে যেমন সুবিচার হয় না, তেমনি ভারতের ভাষাসমস্যার প্রকৃত দিক উদ্‌ঘাটন না ক'রে জনসংখ্যা বা মাতৃভাষায় হিসাব নির্ণয় আসল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর। কাজেই ভারতীয় ভাষার সার্বিক চিত্র উহ্য রেখে কেবল মাতৃভাষা গণনা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতারই সামিল। ভারতীয় ভাষাগুলির সমীক্ষাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পুণায় অনুষ্ঠিত (মে, ১৯৫৩) ভাষাতাত্ত্বিকদের সম্মেলনে এই আদর্শ পূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই আদর্শের সূত্রগুলি এই—

(a) Basic descriptive analysis of the languages and dialects to be found in India.

(b) Recording of all the available materials in each language / dialect such as folk songs, folk literature, proverbs, stories, fables, etc.

(c) For literary languages with a continuous history, (i) critical editions of texts, (ii) historical grammars, (iii) modern descriptive analysis of the literary standard and of the spoken varieties of the same.

(d) Typology of material culture from a material point of view.

(e) Dialect geography and atlases of individual regional languages and dialects

(f) Adequate description of primitive languages.

(g) A complete record of the full vocabularies of each dialect.

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে হিন্দীর আড়ম্বর জয়যাত্রা ও ঢক্কানিনাদে যে বিপুল ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাতে ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলি কেবল ধুলায় ধূসর ও মলিন হয়ে উঠছে না, ক্রমশ পিছু হটেও যাচ্ছে, আর পণ্ডিতী প্রতিশ্রুতি হয়ে যাচ্ছে কেবল সরকারী নথিপত্রে এবং 'সেমিনার' নামক সর্বভারতীয় কোলাহলের হট্টমেলায়।

# প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার সর্বনাম ॥

শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিক

…১…

বর্তমান নিবন্ধে 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ' বলতে দার্জিলিঙ জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা এবং কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রঙপুর ও দিনাজপুরকে বোঝানো হয়েছে। বঙ্গবিভাগের পর এই জেলাগুলির কোথাও অঙ্গচ্ছেদ, কোথাও পুনর্গঠন হয়েছে। যেমন রঙপুর গোটাই, দিনাজপুরের পূর্বাংশ, কোচবিহারের কিয়দংশ এবং জলপাইগুড়ির পাঁচটি থানা (বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম) তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান এবং বর্তমান বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত এবং ওই সব জেলার ছিন্ন অংশ অন্যান্য জেলার সঙ্গে যুক্ত। ফলে কোনো উপভাষিক বিশেষত্ব এখানে যে জেলার বলে কথিত হয়েছে তা বর্তমানের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। বিভাগোত্তর কালে, দুই বঙ্গের কোনো বঙ্গেই Dialect-Geography বা 'উপভাষা-ভূগোল' প্রস্তুত হয়নি; ফলে, উপভাষাগত বিশেষত্বগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে যেমন প্রদর্শিত হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবেই তা গ্রহণ করতে হবে, কোনো আদর্শের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখবার উপায় নেই। অবশ্য ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের সম্পাদনায় যে 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা) সঙ্কলিত হয়েছে, নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তা এইদিকে আমাদের কিঞ্চিৎ সহায়তা করে।

আলোচ্য নিবন্ধের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে ব্যক্তিগত ও একক প্রয়াসে, ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্ট-সনের মধ্যে,—একক প্রয়াসের ফল বলেই নানা অসম্পূর্ণতা এতে থাকতেই পারে। জনজীবনের বিভিন্ন দিককে অবলম্বন করে, সরাসরি বাস্তব ক্ষেত্র থেকে এই উপকরণমালা সংগৃহীত হয়েছে। এজন্যে প্রধানতঃ (ক) আলোচ্য অঞ্চলের মৌখিক সাহিত্য অর্থাৎ লোকসাহিত্যের ওপর নির্ভর করেছি; (খ) প্রতিদিনের কর্মময় জগতের নানা দিককে গ্রহণ করেছি; সংগ্রহের এই অংশ সম্পূর্ণতই মৌখিক জগৎ থেকে প্রত্যক্ষভাবে আহৃত।

লিখিত উপকরণও গ্রহণ করেছি। রঙপুরে এবং পূর্ব দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির ছিন্ন অংশে রাজনৈতিক কারণেই যাওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই এসব ক্ষেত্রে লিখিত উপকরণের ওপর নির্ভর করতেই হয়েছে। তবে, এই সব অঞ্চল থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৌখিক ও প্রত্যক্ষ পর্যায়ের উপকরণও কিছু পরিমাণে সংগ্রহ করা গেছে।

লিখিত উপকরণ আর নিয়েছি কোচবিহারের বিভিন্ন কবিদের রচনা থেকে, মুদ্রিত

ও অমুদ্রিত উভয় রূপ থেকেই। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সময়ে-সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত এই অঞ্চলের উপভাষার নিদর্শন যা পাওয়া গেছে, তা থেকেও উপকরণ গৃহীত হয়েছে। আধুনিককালে যে সব কথাসাহিত্যিক (যেমন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) বা নাট্যকার (যেমন, তুলসী লাহিড়ী) এই উপভাষাকে তাঁদের যে-সব রচনায় স্থান দিয়েছেন, তা থেকেও যদৃচ্ছা উপকরণ আহরণ করেছি।

লিখিত উপকরণকে উপভাষার আলোচনায় গ্রহণ করতে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে, আমার নেই। কয়েকটি বিশেষ কারণে উপভাষার বর্তমান রূপের সঙ্গে অতীত রূপের তুলনার প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

উপভাষাতেও যে সাহিত্য রচিত হতে পারে, অনেকের কাছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। তাহলে উপভাষারও দুটি রূপ মেলে: মৌখিক ও সাহিত্যিক রূপ। আলোচ্য উপভাষা বিচার করবার সময় তাই কাব্য ও সাহিত্যের ভাষা এবং মৌখিক ভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে লক্ষ্য করা হয়েছে।

'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা' নামে আমি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছি। বর্তমান নিবন্ধটি তারই একটি পরিচ্ছেদ। সমস্ত আলোচনাটিই বিবৃতিমূলক (Descriptive), ভাষাতাত্ত্বিকদের জন্যে প্রাথমিক উপকরণ।

॥ পুরুষ-বাচক সর্বনাম (Personal Pronouns) ॥

১. উত্তমপুরুষ (First Person):

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| প্রথমা: | মুঞঞ, মুঞি মুঁই, মুই। মই, কচিৎ। মোঁ, মো। ম মু। হামা, হামি, হামরা। আম্মি, আমি | হামা, হাম্মা, হাম্যা। হামরা, হামারা, হামেরা। হামারগুলা, —গিলা, —গেলা, —লা, —ঘর। হামরা গেলা, হামারা লা। আমার গুলা, —গেলা, —লা —ঘর। |
| দ্বিতীয়া: | মোঁক, মোক মোঁকে, মোকে। হামাক, আমাক। | হামাক। হামার গুলাক, —গিলাক, —গেলাক, —লাক, —ঘরক। আমার গুলাক, —গিলাক, —গেলাক, —লাক, —ঘরক। |
| তৃতীয়া: | মোঁক দিয়া, —দি'। মোক দিয়া, —দি'। হামাক দিয়া, —দি'। আমাক দিয়া, —দি'। | হামাক দিয়া, —দি'। হামার গুলাক, —গিলাক, —গেলাক, —লাক, —ঘরক দিয়া, —দি'।—আমার-এর পরও এই রূপগুলি যুক্ত হবে। |
| চতুর্থী: | দ্বিতীয়াবৎ | দ্বিতীয়াবৎ |

| | |
|---|---|
| পঞ্চমী : মোর হাতে, —ত্তে। মোরঠে হাতে। মোর থাকি'। মোরঠে থাকি'। আমাতে। —হামার এবং আমার-এর সঙ্গেও এই রূপগুলো যুক্ত হবে। | হামার গুলার হাতে, —তে, —ঠে হাতে, —থাকি', —ঠে থাকি'। এই রকম —গিলার, —গেলার, —লার,—ঘরর প্রভৃতির সঙ্গেও যুক্ত হবে। —আমার-এর পরও এই নিয়ম খাটবে। |
| ষষ্ঠী : মোর। হামার, হামার। আমার। | হামার। হামাদের। হামার গুলার, —গিলার, —গেলার, —লার, —ঘরর। —আমার -এর বেলাতেও এই নিয়ম। |
| সপ্তমী : মোঁত্, মোঁতে; মোত্, মোতে। মোরটে, মোরঠে। মোরত্তি, মোরঠি। হামাত্, আমাত্। হামার টে, —ঠে। আমার টে, —ঠে। হামারত্তি, আমারত্তি। | হামাত্। হামার গুলাত, —গিলাত্, —গেলাত্, —লাত্, —ঘরত্। এইভাবে —টে, —ঠে, —ত্তি যুক্ত হবে। —আমার -এর বেলাতেও একই নিয়ম। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. উত্তম পুরুষের একবচনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় 'মুই' <সং ময়েন। 'মুঞ্ঞ' এবং 'মুঞি' উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কম। 'মই' ( <সং ময়া ) ক্বচিৎ ব্যবহৃত, আধুনিক কালে প্রায় লুপ্ত। তেমনি 'মো' ( <সং মম )-র ব্যবহারও কম। গ্রীয়ারসন্ 'মোঁ' রূপ দিয়েছেন, তার প্রচার ব্যাপক নয়। 'হামি' কেবল রঙপুরেই চলে, 'আমি' তেমনি রঙপুর ও কোচবিহারে; জলপাইগুড়ি দার্জিলিঙে 'আমি' অচল। 'ম' এবং 'মু' উত্তমপুরুষের এক-বচনের এই দুটি রূপও বিরল-প্রচার বা প্রায়-লুপ্ত। কিন্তু নিশ্চয়াত্মক এবং সংযোগমূলক অব্যয়ের সঙ্গে ব্যবহারকালে এদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় প্রাতিপদিকরূপে। যেমন : 'মুহে' অর্থাৎ 'আমিই'। 'মহো' অর্থাৎ 'আমিও'। 'মহো' আসলে 'মোহো', প্রাতিপদিক তখন হবে 'মো'।

খ. গ্রীয়ারসন্ এবং সাময়িকপত্রে খুচরো প্রবন্ধ লেখক দু' একজন উত্তমপুরুষের গৌরবার্থক রূপ প্রদর্শন করেছেন। রঙপুরের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ক্রোধ, দম্ভ, অহঙ্কার, অভিমান ইত্যাদি প্রকাশের রূপে 'হামি' 'হামার' (৬ষ্ঠীতে) প্রভৃতি প্রযুক্ত হয় ( রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২৫ )। এই বিশেষত্ব আমরাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তা কাব্যে ও গানে যে পরিমাণে দেখা যায়, প্রতিদিনের কথ্য ভাষায় সেই পরিমাণে দেখা যায় না। এই উপভাষায়, কাব্যে উত্তমপুরুষের একবচনে গৌরবার্থে বহুবচনের রূপ প্রয়োগ করা হয়। যেমন, গানে : তমার ফুল তো হামা তুলোঁ নাই ( আপনার ফুল তো 'আমরা' অর্থাৎ 'আমি' তুলিনি )। যখন তমরা বাজান রে বাঁশি, তখন হামরা আন্ধন রে আছি ( যখন আপনি বাঁশি বাজান, 'আমরা' অর্থাৎ 'আমি' রাঁধি )।

গ. কাব্যে কচিৎ একবচনে 'হাম' পাওয়া যায়, নয়তো 'হাম' সাধারণভাবে বহুবচন-জ্ঞাপক। যেমন, হাম সে যাইমো সঙ্গে। কাব্যে 'মুই'-এর বদলে কখনও 'মুইও' বা 'মুইয়ো' মেলে। যেমন, মুইয়ো নারী।

ঘ. 'হাম' এই প্রাতিপদিক দিয়েই উত্তমপুরুষের সব কারকের এবং দু-বচনের রূপ হয়। 'মো' এই প্রাতিপদিক দিয়ে উত্তমপুরুষের এক বচনের রূপগুলো হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বহুবচনে 'মোরঘর' বা 'মোরলাকৃদি' ইত্যাদি প্রত্যাশিত রূপ অচল।

ঙ. 'হামা' এই উপভাষায় মূলত: উত্তমপুরুষের বহুবচনাত্মক রূপ, তবে কাব্যে বা বিরল ক্ষেত্রে এটি একবচনেও চলে। একই সঙ্গে 'হামা'র দু বচনে ব্যবহারের পেছনে অন্য ইতিহাস আছে বলে মনে হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় 'আহ্মি' (আমি) ছিল বহুবচনের রূপ, পরে তা একবচনেই ব্যবহৃত হতে থাকলে নতুন করে বহুবচনের রূপ তা থেকে হয় 'আমরা'। কিন্তু উপভাষাগুলিতে মধ্যযুগীয় রীতিই বহাল থাকে ; যেমন, পূর্ব সিলেটিতে, চাকমা ভাষায়, আলোচ্য উপভাষাতে, অসমীয়াতে। কাজেই, দুই বচনের এই মিশ্রণের ফলেই, 'হামা'ও দু বচনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উত্তমপুরুষের প্রথমার বহুবচনের সর্বাধিক প্রচলিত রূপ হল 'হামরা'। 'মোরা' সেই তুলনায় বিরল-চলিত। ওপরে বহুবচনের আর একটি রূপ 'হামা'র উল্লেখ করেছি, গ্রীয়ারসন্ তার উল্লেখ করেননি। অথচ, কাব্যে ও কথ্য ভাষায় দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়িতে এটি বেশ ব্যবহৃত হয়। কোচবিহারে বহুবচনে 'হামরা'র চেয়ে 'আমরা' বেশি চলে, রঙপুরে তেমনি 'হামরা' ও 'আমরা' সমভাবে। দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়িতে 'হামারলা' (সমীভবনের ফলে 'হামাল্লা' বা 'হামাল্লা'. এবং 'হামারঘর' ব্যাপকভাবে চালু আছে। গ্রীয়ারসন্ উল্লিখিত 'হামারগুলা' রঙপুরেই সীমাবদ্ধ, কচিৎ কোচবিহারেও মেলে। দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়িতে 'হামরা'র কাব্যগত রূপ হল 'হামেরা' কথ্য ভাষাতেও কখনো তা পাই।

চ. উত্তমপুরুষের দ্বিতীয়ার একবচনে সবচেয়ে বেশি চলে 'মোক' ; অধুনা 'আমাকে'র প্রভাবে 'মোকে' মেলে। 'মোক' থেকে 'মোখ্' বা 'মোগ্' কাব্যে 'মোকো' বা 'মোখো'। গ্রীয়ারসন্ 'মোঁক' বা 'মোঁকে রূপ প্রদর্শন করলেও আনুনাসিকতা সর্বত্র দেখিনি। কোচবিহারের 'আমাক' এবং রঙপুরে 'আমাক'-এর সঙ্গে 'হামাক' ও 'হামাকে' দ্বিতীয়ার একবচনে চলিত আছে. 'হামাক' জলপাইগুড়ি-দার্জিলিঙে বহুবচনে ব্যবহৃত হলেও, কাব্যে একবচনেও পাই। গ্রীয়ারসন্ এইজন্যেই বোধ হয় এটিকে দু বচনেই উল্লেখ করেছেন।

ছ. 'হামা' এবং 'হামার'-এর উত্তর —গুলা, —গিলা, —গেলা, —লা এবং —ঘর প্রভৃতি বহুবচনাত্মক প্রত্যয় এবং শেষে দ্বিতীয়া বিভক্তির 'ক' জুড়ে উত্তমপুরুষের দ্বিতীয়া বিভক্তির বহু-বচনের রূপ গড়া হয়। 'হামার লাক' (হামালাক) এবং 'হামার ঘরক' দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়িতে ; 'হামারগুলাক' রঙপুরে ; এবং 'আমার গুলাক', 'আমার ঘরক' রঙপুর-কোচবিহারে দেখা যায়।

জ. উত্তমপুরুষের তৃতীয়ার একবচনে 'মোকদিয়া' এবং 'দিয়া'র সংক্ষিপ্ত রূপ 'দি' প্রধানতঃ চলে। রঙপুরে 'হামাকদিয়া' এবং কোচবিহারে 'আমাকদিয়া' খুব ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ: মোক দি কাজখান করেয়া নিলেক। হামাক দিয়া ঢেরা কাটাছে। জলপাইগুড়িতে বহুবচনে এই 'হামাক দিয়া' ব্যবহৃত হয়। তৃতীয়ার বহুবচনে দ্বিতীয়ার বহুবচনের উত্তর 'দিয়া' বা 'দি' যুক্ত হয়।

ঝ. অপাদান কারকের অর্থ-জ্ঞাপক অনুসর্গ 'হইতে' এই উপভাষায় 'হাতে' এবং শেষে শুধুই 'তে' হয়ে যায় বলে একবচনে মেলে 'মোর হাতে', 'মোরতে', 'হামারতে'। ঠাঁই >—ঠে, টে বহুশঃ 'হাতে'র পূর্বে যুক্ত হয়ে হয় 'মোরঠে হাতে', 'হামারঠে হাতে'। গ্রীয়ারসন্ 'ঠাঁই'-এর উল্লেখ করলেও কাব্যে বা কথ্য ভাষায় এর ব্যবহার তেমন নেই। বরং ঠাঁই > ঠেন, টে ইত্যাদি পাওয়া যায়। রঙপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'হাতে'র বদলে 'হানে' বা 'হনে' মেলে। গ্রীয়ারসন্ 'খনে'র কথা বলেছেন। 'খনে', 'হনে' বা 'হানে'র প্রচার প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম।

অনুসর্গ পদ 'থাকিয়া' হয় 'থাকি'। 'থাকির' আগেও 'টে' বা 'ঠে' যুক্ত হয়। কোচবিহার ও রঙপুরে এগুলো 'আমার'-এর পর যুক্ত হয়। বহুবচনের উত্তর এগুলো যুক্ত হয়ে পঞ্চমীর বহুবচনের রূপ নির্দেশ করে।

ঞ. ষষ্ঠীর একবচনে 'মোর' বেশি চলিত। কোচবিহার ও রঙপুরে 'হামার' এবং 'আমার' সমপরিমাণে চলে। 'হামার' জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংএ যথারীতি বহুবচনের পদ। অন্য জেলাগুলিতে বহুবচনের রূপের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বসিয়ে বহুবচন করা হয়। হজসন্ তাঁর বইতে (পৃ. ৫৪) ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে 'হামারো' এই রূপের উল্লেখ করেছেন। এটি স্পষ্টই কাব্যের রূপ।

ট. ষষ্ঠী বিভক্তির এক বচনে, আত্মবাচক সর্বনাম রূপে কাব্যে মেলে 'আপনকার' বা 'আপেনকার'। গ্রীয়ারসন্ মনে করেছিলেন, 'কার'-এর মধ্যে দুটো ষষ্ঠী বিভক্তি আছে: 'কা' হিন্দী, 'র' বাঙলা। 'কার' যে গোটাই একটি বিভক্তি, এ বোধ হয় তাঁর জানা ছিল না।

ঠ. সপ্তমী বিভক্তির একবচনে 'মোত্', 'মোতে', 'হামাত্' ইত্যাদি কথ্য ভাষায় বিরল-চলিত, কাব্যে ও সাহিত্যেই মেলে। 'মোরটে', 'মোরঠে', 'মোরত্তি', 'হামারত্তি' ইত্যাদিই বেশি চলে। সমীভবনের ফলে এগুলির রূপ দাঁড়ায় এই: 'মোটটে', 'মোঠঠে', 'মোত্তি' বা 'হামাত্তি' (হামাত্তি)। 'ত্তি'র উদ্ভব সম্ভবতঃ এইভাবে: ঠাঁই > ঠেঁ, ঠে > থে > থি > ত্তি। বহুবচনের রূপের উত্তর এগুলো ব্যবহৃত হয়ে উত্তমপুরুষের সপ্তমীর বহুবচনের রূপ নির্দেশ করে।

...৩...

২. মধ্যমপুরুষ (Second Person) :

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| প্রথমা : | সাধারণ : তুঁই, তুই। তম্হা, তম্যহা। 'ত' এবং 'তু', বিশেষ ক্ষেত্রে। সম্ভ্রমার্থক : তোহ্মরা, তোমরা, তমোরা, তম্রা, তমা, তুমা, তুমি। | সাধারণ : তম্যহা, তম্হা, তম্যা। তোম্হরা, তোহ্মরা, তম্যরা, তোমরা, তমরা। সম্ভ্রমার্থক এক বচনেরই রূপ; এবং তমরা, তোমরা, তোমারা-র পর ক্রিয়াপদে সাম্মানিক 'ন' যোগ। এবং যথারীতি একবচনের উত্তর —গুলা, —গিলা, —গেলা, —লা ও —ঘর যুক্ত করা। |
| দ্বিতীয়া : | সাধারণ : তোক। সম্ভ্রমার্থক : তোহ্মাক, তোম্হাক, তম্হাক, তোমাক, তমাক। | সাধারণ : তোমাক, তমাক, ইত্যাদি। সম্ভ্রমার্থক : একবচনেরই রূপ; এবং যথারীতি একবচনের উত্তর —গুলাক, —গিলাক, —গেলাক, —লাক ও —ঘরক যুক্ত করা। |
| তৃতীয়া : | সাধারণ : তোক দিয়া, —দি সম্ভ্রমার্থক : তোহ্মাক, তোম্হাক, তম্হাক তমাক দিয়া, —দি। | সাধারণ : তোমাক, তম্হাক, তমাক দিয়া, —দি। সম্ভ্রমার্থক : একবচনেরই রূপ; এবং যথারীতি একবচনের উত্তর —গুলাক, —গিলাক, —গেলাক, —লাক ও —ঘরক প্রভৃতির শেষে 'দিয়া', 'দি' যুক্ত করা। |
| চতুর্থী : | দ্বিতীয়াবৎ | দ্বিতীয়াবৎ। |
| পঞ্চমী : | সাধারণ : তোর হাতে, —তে। —তোরঠে হাতে। তোর থাকি, তোরঠে থাকি। সম্ভ্রমার্থক : তোমার, তোহ্মার, তম্হার, তমার হাতে, —তে, —থাকি; —ঠে হাতে, —ঠে থাকি। | সাধারণ : তম্হার, তমার, তোমার ইত্যাদি হাতে, —তে, —টে, —থাকি; —টে হাতে, —ঠে হাতে; —টে থাকি, —ঠে থাকি। সম্ভ্রমার্থক : এক বচনেরই রূপ; এবং তম্হার, তমার, তোমার ইত্যাদির পর যথারীতি বহু-বচনের প্রত্যয়ের সঙ্গে পঞ্চমীর চিহ্ন যুক্ত করে। |
| ষষ্ঠী : | সাধারণ : তোর। সম্ভ্রমার্থক তম্হার, তমার, তোমার ইত্যাদি। | সাধারণ : তম্হার, তমার, তোমার। সম্ভ্রমার্থক : এক বচনেরই রূপ; এবং তম্হার, তমার, তোমার গুলার, —গিলার, —গেলার, —লার, —ঘরর। |
| সপ্তমী : | সাধারণ : তোরটে, —ঠে, —তি। সম্ভ্রমার্থক : তম্হার, তমার, তোমারটে, —ঠে, —তি। | সাধারণ : তম্হার, তমার, তোমার টে, —ঠে, —তি। সম্ভ্রমার্থক : এক বচনেরই রূপ; এবং তম্হার, তমার, তোমার পর বহুবচনের প্রত্যয়ের সঙ্গে —টে, —ঠে, —তি যুক্ত করে। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. আলোচ্য উপভাষায় 'তুই' একাধারে মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক ও সাধারণ রূপ নির্দেশ করে ; চলিত বাঙলার মতো মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক ও সাধারণ এই রূপভেদ নেই। সানুনাসিক 'তুঁই' বিরল প্রচার। গ্রীয়ারসন্ 'তই' এবং 'তোঁ'র উল্লেখ করেছেন। 'তোঁ' কাব্যে ব্যবহৃত হয়, তাও কচিৎ। 'তই' অধুনা লুপ্ত। আমরা 'ত' এবং 'তু' পেয়েছি, কিন্তু নিশ্চয়ার্থক এবং সংযোগমূলক অব্যয়ের সঙ্গে ছাড়া পাইনি। যেমন, 'তহো' বা 'তহ' অর্থাৎ 'তুইও'। 'তুহে' অর্থাৎ 'তুইই'। 'ত' এবং 'তু' এসব ক্ষেত্রে প্রাতিপাদিক। কাব্যে পাই 'তুইও' বা 'তুইয়ো'—'তুই' অর্থে ই।

খ. সম্ভ্রমার্থে 'আপনি', 'আপনা' প্রভৃতির প্রচলন নেই। প্রাচীন বাঙলার মতো 'তুমি', 'তোমা' দিয়েই সম্ভ্রম জ্ঞাপন করা হয়। মূলতঃ বহুবচনের পদ বলেই একবচনেও বহুবচনেরই রূপ 'তম্‌হরা', 'তম্‌রা' 'তোমরা' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। একই কারণে এগুলো বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়। এগুলোর সঙ্গে আবার বহুবচনের প্রত্যয় –গুলা, –গিলা, —গেলা, – লা, – ঘর প্রভৃতি জুড়ে বহুবচনত্বকে দ্বিগুণ করে নেওয়া হয়। 'তুমি' প্রভৃতির পর ক্রিয়াপদে সম্ভ্রমার্থক 'ন' যোগ করা হয় বাঙলা ভাষার চলিত নিয়মানুসারে। যেমন : তুমি ফান্দী চলি যাবেন শিকার করিতে। তমরা ( আপনি একবচন ) যাবেন দূরোন্তাশে। তমরালা ( বা তোমারলা, সমীভবনের ফলে 'তোমাল্লা' ) কুন্ঠে যাবেন। তোমার ঘর *( আপনারা ) কালি হামারতি ( বা হামাত্তি ) আসিলেন না ক্যানে* তোমারগুলো ( আপনারা ) কি নাখা মান্‌ষি ( কেমন ধারা মানুষ )।

কথ্য ভাষায় এবং বিশেষতঃ কাব্যে সম্ভ্রমার্থক আর একটি রূপ পাই 'তমা' <তোমা। মূলতঃ বহুবচনের পদ বলে বহুবচনে তো বটেই, উপরন্তু একবচনেও এটি অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : হে বা তমা ( আপনি ) কি ঠাকুর হইসেন। তমা ( আপনারা ) আজি চলি যান। 'তমা'র রূপান্তর 'তুমা'। এটিও দুবচনেই সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয়।

গ. মধ্যমপুরুষের সাধারণ রূপ 'তুই'-এর বহুবচন নেই। 'তোরলা', 'তোরঘর' ইত্যাদি প্রত্যাশিত রূপগুলো অজ্ঞাত। গ্রীয়ারসন্ বহুবচনে 'তোমা', 'তোমাগুলা', 'তোমরা' প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু এগুলো সাধারণ কি সম্ভ্রমার্থক, তা জানান নি। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'তুমরা', 'তুম্রাঘর' প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন ( ও. ডি. বি. এল্, পৃ. ৮২০ ) এখানেও এই রূপগুলো সাধারণ কি সম্ভ্রমার্থক, তা অনুল্লিখিত। আসলে 'তম্‌হরা', 'তমরা', 'তোমরা' ইত্যাদি যখন মধ্যমপুরুষের প্রথমা বিভক্তির সাধারণ রূপের বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ক্রিয়াপদের উত্তর সম্ভ্রমার্থক 'ন' যুক্ত হয় না। কিন্তু এই রূপগুলোই যখন সম্ভ্রম জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়, তখন ক্রিয়াপদের উত্তর 'ন' যোগ করা হয়। অবশ্য, ক্রিয়াপদের পর 'ন' যোগ করা হোক বা না হোক, দেখা যায়, 'তম্‌হরা', 'তমরা', 'তোমরা' ইত্যাদি প্রধানতঃ সম্ভ্রমার্থক। মধ্যমপুরুষের

প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের সাধারণ রূপ নির্দেশ করতে 'তম্‌হরা', 'তমরা', 'তোমরা' প্রভৃতির পর 'ন' বিহীন ক্রিয়াপদ ব্যবহারের প্রবণতা কোচবিহার-রঙপুরেই বেশি। জলপাইগুড়ি এখানে অনেকটা রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। একবচনের 'তুই'ই সেখানে বহুনাঃ বহুবচন জ্ঞাপন করে থাকে। নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে 'তোরা' এখানকার উপ-ভাষায় কিছু পরিমাণে অনধিকার প্রবেশ করেছে।

ঘ. দ্বিতীয়া বিভক্তির, সাধারণ রূপে, একবচনে 'তোক' ব্যাপকভাবে চলে। কাব্যে পাই 'তোকো'। মহাপ্রাণ তার ফলে 'তোখ্' বা কাব্যে 'তোখো'। সম্ভ্রমার্থক রূপের একবচনে 'তম্‌হাক', 'তমাক' জলপাইগুড়ি দার্জিলিঙে এবং 'তোমাক' কোচবিহার-রঙপুরে চলে। কাব্যে, একবচনে পাই 'তোম্‌হাকো' বা 'তোমাকো' এইখানে আর একটি সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব উল্লেখ করা প্রয়োজন: আলোচ্য উপভাষায় রচিত প্রেমের গানে বহুনাঃ প্রেমিক-প্রেমিকা নিজেদের 'আপনি'রূপে সম্বোধন করে, যদিও সাধারণ রূপ 'তুই'ও খুব চলে।

ঙ. 'তুই'-এর মতো 'তোক'-এরও বহুবচন নেই। 'তম্‌হাক', 'তমাক', 'তোমাক' ( ক্রিয়ার পর 'ন' যোগ না করে ) দিয়েই দ্বিতীয়া বিভক্তির সাধারণ রূপের বহুবচন সাধিত হয়। দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়িতে অনেক সময় একবচনের রূপই অবিকৃতরূপে বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। একবচনের সম্ভ্রমার্থক 'তম্‌হাক', 'তমাক', 'তোমাক' ইত্যাদি বহুবচনেও চলে। এ ছাড়া বহুবচনের প্রত্যয় (—গুলাক, —গিলাক, —গেলাক, —লাক, —ঘরক) যোগে তো বহুবচন হয়ই।

চ. তৃতীয়া এবং পঞ্চমীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো নতুন বক্তব্য নেই। উত্তমপুরুষের আলোচনাকালে এ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, এখানেও তা খাটে। পঞ্চমীর একবচনের সাধারণ রূপ 'তোর তে' সমীভবনের ফলে 'তোত্তে' হয়ে যায়। তেমনি 'তোর থাকি' হয় 'তোথ্‌থাকি', 'তোর ঠে থাকি' হয় 'তোঠ্ ঠে থাকি'।

ছ. ষষ্ঠী বিভক্তিতে, এক বচনের সাধারণ রূপে, কাব্যে পাই 'তোহর' বা 'তোহোর', —'তোহ' এই প্রাতিপদিকের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বসিয়ে। ষষ্ঠী বিভক্তিতে, কাব্যে অনেক সময় আধিক 'এ' যুক্ত হয়, তাই পেয়েছি 'তোহোরে' ( তোমার )। বাঙলা দেশের সব অঞ্চলের উপভাষাতেই এবং লোক সাহিত্যেই ষষ্ঠী বিভক্তির নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়।

জ. ষষ্ঠীর বহুবচনে, সম্ভ্রমার্থে, বহুবচনের প্রত্যয়যুক্ত পদ তো পাওয়া যায়ই, উপরন্তু, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, একবচনের রূপকেও পাওয়া যায় বহুবচনে। বি. এইচ. হজসন তাঁর বইতে ( পৃ. ৬৪ ) বহুবচনের আর একটি রূপের উল্লেখ করেছেন 'তুমারো', এটি কাব্যে মেলে, কথ্য ভাষাতেও কচিৎ, এবং তা সম্ভ্রমার্থক নয়।

ঝ. সপ্তমী বিভক্তির রূপগুলো সম্পর্কে কোনো নতুন কথা নেই। এ প্রসঙ্গে উত্তম-পুরুষের আলোচনায় এই অংশ দ্রষ্টব্য।

ঞ. সম্ভ্রম জ্ঞাপন করবার জন্যে 'দেউনিয়া' এই বৃত্তিবাচক বিশেষণ শব্দটিকে মধ্যম

পুরুষের সর্বনাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কখনো এটি একবচনে, কখনো বহুবচনে ব্যবহৃত হয়, অধিক সম্মান প্রদর্শনের জন্তে। শব্দটির ষষ্ঠী বিভক্তিতে রূপের উত্তর বহু-বচনাত্মক প্রত্যয় 'ঘর' যুক্ত হয়। ফারসী দীওয়ান >বাঙলা দেওয়ান+ইয়া > দেউনিয়া। আইন-আদালত রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি এবং প্রসারে 'গৃহকর্তা', শেষে সাধারণভাবে 'কর্তা' বা কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি অর্থে এটি এই উপভাষায় প্রচলিত আছে। যেমন, কুন্ঠে যাছন বা হে দেউনিয়া ( কর্তা, যাচ্ছেন কোথায় )। শুনেন বা রে দেউ-নিয়ারঘর ( কর্তামশাই, শুনুন )।

…৪…

৩. প্রথম পুরুষ ( Third Person ) :

| | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| প্রথমা : | সাধারণ : তাঞ, তাঞি। তাঁয়, তায়। তাঁহ, তেঁহ, তাঁই। সম্ভ্রমার্থক : তামা, তাম্‌রা, তামেরা। তেঁহ, তেহোঁ, তাঁই। | সাধারণ : তারঘর, তারলা, ক্বচিৎ তারা। সম্ভ্রমার্থক : এক বচনেরই রূপ ; এবং তোমার ঘর, তামারলা। |
| দ্বিতীয়া : | সাধারণ : তাঁক, তাক। সম্ভ্রমার্থক : তাম্‌রাক, তামাক। | সাধারণ : তাঁর, তার ঘরক, —লাক। তাক। সম্ভ্রমার্থক : একবচনেরই রূপ ; এবং তামার ঘরক, —লাক। |
| তৃতীয়া : | সাধারণ : তাঁক, তাক দিয়া, —দি। সম্ভ্রমার্থক : তাম্‌রাক, তামাক দিয়া, —দি। | সাধারণ : তাঁক, তাক দিয়া,—দি। তার ঘরক দিয়া, —দি। তারলাক দিয়া, —দি। সম্ভ্রমার্থক : এক বচনেরই রূপ ; এবং তামার ঘরক দিয়া, —দি। তামারলাক —দিয়া,—দি। |
| চতুর্থী : | দ্বিতীয়াবৎ। | দ্বিতীয়াবৎ। |
| পঞ্চমী | সাধারণ : তাঁর, তার হাতে, —তে ; এইরকম : —টে হাতে, —ঠে হাতে ; —থাকি, —ঠে থাকি। সম্ভ্রমার্থক : তামার হাতে, —তে ; —টে হাতে, —ঠে হাতে ; —থাকি, —ঠে থাকি। | সাধারণ : এক বচনেরই রূপ ; এবং তার ঘরর হাতে, —তে, —টে হাতে, —ঠে হাতে, —থাকি —ঠে থাকি। তারলার হাতে, —তে, —টে হাতে, —ঠে হাতে, —থাকি, —ঠে থাকি। সম্ভ্রমার্থক : এক বচনেরই রূপ ; এবং তামার-ঘরর ও তামার লার পর —হাতে, —তে, —টে — টে হাতে, —ঠে হাতে, —থাকি, —ঠে থাকি যুক্ত করে। |

| | |
|---|---|
| ষষ্ঠী: সাধারণ: তাঁর, তার। সম্ভ্রমার্থক: তামার, তাম্‌রার। | সাধারণ: তাঁর, তার। তারঘরর, তারলার। সম্ভ্রমার্থক: এক বচনেরই রূপ; এবং তামার-ঘরর, তামারলার। বিশেষ ক্ষেত্রে: তারদের, তামান, তাম্মার। |
| সপ্তমী: সাধারণ: তাঁর, তারটে, —ঠে, —তি। সম্ভ্রমার্থক: তামার টে, —ঠে, —তি। তামরারটে, —ঠে, —তি। | সাধারণ; একবচনেরই রূপ এবং তাঁর, তার ঘররটে, —ঠে, —তি; তাঁর, তারলার —টে, —ঠে, —তি। সম্ভ্রমার্থক: এক বচনেরই রূপ; এবং তামার ঘররটে, —ঠে, —তি। তামারলার টে, —ঠে, —তি। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. প্রথমার একবচনে 'তানি'র উল্লেখ করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ( ও. ডি. বি. এল্., পৃ. ৮২৭ ), কিন্তু আমরা তা পাইনি। প্রথমার একবচনের সাধারণরূপে সবচেয়ে বেশি চলে তায় <তস্য। 'তাঁয়' বা 'তাঞ' রূপে উচ্চারণও মেলে। 'তাঞি' এই উচ্চারণ খুবই কম। তবে লিখিতরূপে পাওয়া যায়। যেমন, রঙপুরের কবি দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়' কাব্যে: যেহিজন ভজে, তাঞি ভবে হয় পার। 'চণ্ডিকাবিজয়' কাব্যের সম্পাদক পঞ্চানন সরকার 'তাঞি' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: এই শব্দটি রংপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে শুনা যায়। অন্যত্র ইহার উচ্চারণ 'তাঞে' ( পৃ. ৩৪৯, পাদটীকা )। 'তাঁয়' এই অনুনাসিক উচ্চারণ সম্ভ্রমার্থক নয়। কিন্তু সম্ভ্রমার্থেও এটি কাব্যে কোনো কোনো সময় ব্যবহৃত হয়। 'সো'র ব্যবহার একেবারেই নেই।

খ. প্রথম পুরুষের একবচনের সম্ভ্রমার্থক রূপ 'তামা' কিন্তু, স্পষ্টই যা বহুবচনের রূপ, সেই 'তামরা' ও একবচনে প্রযুক্ত হয় সম্ভ্রম জ্ঞাপনার্থে। বহুবচনের রূপ বলে 'তাম্‌রা' স্বাভাবিক কারণেই বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়। যেমন: তামা আজি আসে নাইরো, ( তিনি আজ আসেননি )। তামরা কোটে গেইল্ ( তিনি কোথায় গেলেন, ক্রিয়ার সঙ্গে সম্ভ্রমার্থক 'ন' যুক্ত হয়নি )। 'তামরা' থেকে কাব্যে পাই 'তাঁওরা', বহুবচনার্থে। কাব্যে ইতর প্রাণীর সঙ্গেও সম্ভ্রমার্থক রূপ ব্যবহৃত হয়। সম্ভ্রমার্থক 'তাম্‌রা' অল্পবিস্তর সব কটি জেলাতেই চলিত আছে।

গ. প্রথমার বহুবচনে, সাধারণ রূপের উত্তর, যথারীতি —গুলা, —গিলা, —গেলা, —লা, —ঘর প্রভৃতি যুক্ত হয়। এগুলো জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙে চলিত। কোচবিহার ও রঙপুরে চলিত বাঙলার 'তারা'ও যৎকিঞ্চিৎ চলিত আছে।

ঘ. দ্বিতীয়া বিভক্তির 'তাক' একবচন ছাড়াও বহুবচনে এবং সাধারণ অর্থ ছাড়াও সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'তাকে' আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। 'তায়ে' মেলে কাব্যে।

সম্ভ্রমার্থক রূপ 'তামা', 'তাম্রা' ইত্যাদি কথ্য ভাষাতেই মেলে। কাব্যে 'তাক' বা 'তারে' দিয়েই কাজ সারা হয়।

ঙ. ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ হিসেবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'তাহে' (তারহে)-র উল্লেখ করেছেন। মধ্যমপুরুষের ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনের সাধারণ রূপ 'তোহোরে' (তোমার) এখানে তুলনীয় (দ্রঃ মধ্যমপুরুষের ব্যাখ্যা ও উদাহরণের 'ছ' অনুচ্ছেদ)। সুনীতিকুমার কথিত এই 'তাহে' (তার্হে) আলোচ্য উপভাষার, ষষ্ঠীর বিভক্তির নিশ্চয়ার্থক রূপও হতে পারে। নিশ্চয়ার্থক 'ই' এই উপভাষাতে 'হে' হয়। ফলে 'তারই' হয় 'তার্হে'। বি. এইচ. হজসন ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনের রূপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'উন্নার'। এটি সাধারণ কি সম্ভ্রমার্থক, তা অনুল্লিখিত। এটির প্রয়োগ আমরা পাইনি। তবে, এই উপভাষাতে সম্ভ্রমবাচক নির্দেশক সর্বনাম 'উম্হার', (উহার, ওঁর) চলিত আছে; হজসন-কথিত 'উন্নার'-এর সঙ্গে 'উম্হার'-এর যোগ থাকা বিচিত্র নয়। মনে হয়, হজসন নির্দেশক সর্বনামটিকে পুরুষবাচক সর্বনাম (প্রথম পুরুষে) রূপে উল্লেখ করেছেন।

চ. ষষ্ঠীর বহুবচনে, সম্ভ্রমার্থক একটি রূপ হল 'তাম্মার' 'তাঁদের' বোঝাতে। সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী একটি প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১৩১২, প্রথম সংখ্যা) এই ধরনের প্রয়োগকে 'যাবনিক' অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বলে উল্লেখ করেছিলেন। শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে' মেলে 'তানামার'। তবে, সেখানে সর্বনামটির জাতিভেদের কথা উল্লিখিত হয়নি। হয়তো সুরেন্দ্রচন্দ্র রঙপুরের কোনো বিশেষ অঞ্চলে এই প্রয়োগ দেখেছিলেন।

৪. প্রথম পুরুষ: ক্লীবলিঙ্গ, 'তা' শব্দ:

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| তাক্। সিটা, সেইটা। সিখান, সেইখান। সেকনা, সেকিনা; সেইকনা, সেইকিনা; সেইগ্না, সেইংনা। | তাক্। সেগিলা, সেগ্লা, সেইলা, সেই-লা; সেইগিলা, সেইগ্লা। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. 'তদ্' শব্দজাত 'তা'-এর উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির 'ক্' জুড়ে 'তাক্' হয়েছে। এক এবং বহু—দু বচনেই এটি ব্যবহৃত হয়। কাব্যে ও কথ্যভাষায় উভয়েই এটির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন: তাক দিয়া (তা দিয়ে) গাঁথিনো মালা। যাক নাই শুনোঁ আপন কানে, তাক (তা, সে সব) না পাইতাও গুরুর কওনে। অবশ্য এই প্রয়োগ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও পেয়েছি: তাক পিছি (তা পরে) মথুরাক করিউ গমন।

খ. এই উপভাষায় পদাশ্রিত নির্দেশক 'টা' 'খান' প্রভৃতি সর্বনাম শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, সাধু ও চলিত বাঙলার রীতি অনুযায়ী বিশেষ্য পদের পরে নয়। যেমন : সিটা কথা ( সেই কথাটি )। সেইকনা গান ( সেই গানটি, গানখানি )।

গ. বহুবচনের উদাহরণ : সেইলা গুয়া ( সেই সুপুরিগুলো )। সেইগ্‌লা গাহেনা ( সেই গহনাগুলি )।

॥ নির্দেশক সর্বনাম ( Demonstrative Pronouns ) ॥

৫. নিকট-নির্দেশক সর্বনাম ( Proximate Demonstrative ) : এ, ইহা

(ক) প্রাণিবাচক : সাধারণ ও সম্ভ্রমার্থক :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| সাধারণ : ইয়ায়, ইয়াঁয়, ইওায়, ইএ়ায়। এ্যায়, এ্যাঁয়, এঁয়ায়, এএ়ায়। হি, হিটা। এই, এইটা, এইকনা। সম্ভ্রমার্থক : ইম্‌রা, ইমিয়্যা, ইশ্‌মা। ইম্যা, ইম্মা, ইম্যায়। এম্‌রা, এ্যাম্‌রা, এমারা, এমিরা, এশ্‌মা। এম্যা, এম্মা, এম্যায়। | সাধারণ : ইয়ার, ইয়াঁর ইত্যাদির পর যথারীতি 'ঘর' বা 'লা'। এ্যার, এঁয়ার ইত্যাদির পর যথারীতি 'ঘর' বা 'লা' এইগ্‌লা, এইল্‌লা, এইলা, হিলা। সম্ভ্রমার্থক : এক-বচনেরই রূপ ; এবং ইমার, এমার ইত্যাদির পর যথারীতি 'ঘর' বা 'লা'। |

সাধু ও চলিত বাঙলার নিকট-নির্দেশক সর্বনাম 'এ' সাধারণভাবে বাঙলায় যে কোনো উপভাষায় 'ই' বা 'ঈ' রূপ নেয় ( ও. ডি. বি. এল্., পৃ. ৮৩০ )। আলোচ্য উপভাষাতেও তাই হয়েছে। সুনীতিকুমারের মতে এই পরিবর্তন বিহারী ভাষার প্রভাবে ঘটেছে ( ঐ, পৃ. ৮৩৪ )। আলোচ্য উপভাষাতে অবশ্য, 'এ' এই নিকট-নির্দেশক সর্বনামটিকে না পাওয়া যায়, এমন নয়। 'এ'র বাঁকা উচ্চারণ এবং বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহৃত হওয়ায় এই উপভাষায় তা পাই এইভাবে : এ্যায়, এ্যাঁয়, এয়ায়। সম্ভ্রমার্থক 'ন' 'ম' হওয়ায় প্রাতিপদিক পাই 'এম', 'এমা'। 'এ' 'ই'-তে পরিবর্তিত হওয়ায় সাধারণ রূপ হয় 'ইয়ায়' বা 'ইএ়ায়' ইত্যাদি, এবং সম্ভ্রমার্থক রূপের প্রাতিপদিক হয় 'ইম', 'ইমা'। 'ই'তে উচ্চারণকালে জোর পড়ায় 'ই' হয় 'হি'।

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. 'ইয়ায়' এবং 'ইএ়ায়' বা 'ইয়াঁয়' সমান ভাবে পাওয়া যায়। তেমনি, এ্যায়, এ্যাঁয় বা এঁয়ায়। আলোচ্য উপভাষায় নিশ্চয়ার্থক রূপের সঙ্গে অনেক সময় এই রূপগুলি অভিন্ন, প্রসঙ্গ জানা না থাকলে তা নির্ণয় করাও কঠিন হয়। যেমন : ইয়ায়, এ্যায়=এ ব্যক্তি, এ ব্যক্তিই। অবশ্য, প্রত্যাশিত রূপ 'ইয়ায় এ', 'এ্যায় এ' প্রভৃতি প্রচলিত আছে।

পূর্ববঙ্গের উপভাষায় প্রথম পুরুষের সর্বনামে যেমন 'য়ি' যুক্ত হয়, আলোচ্য উপভাষাতে তেমনি নির্দেশক সর্বনামের সঙ্গে। যেমন, সে > হে, হা+য়=হায় ( পূর্ববঙ্গে, মধ্যযুগের রীতি অনুসারে কর্তৃকারকে এখনও য়-বিভক্তি ব্যবহৃত হয় )। 'হ' 'হিটা', 'হিলা' প্রভৃতি একদিকে তুচ্ছার্থক সর্বনাম নয়, অপরদিকে এগুলো অপ্রাণিবাচক। রঙপুরে, কাব্যে মেলে 'ইয়াও' ( যেমন, ইয়াও ক্যামন মানুষি )। কথ্য ভাষাতেও কচিৎ এটির প্রয়োগ মেলে। অন্যান্য উদাহরণ : ইয়ায় কালি আইচে। এ্যায় আজি সাকালে মোর বাড়ীত্ গেইছে। হি মানুষটা বড্ডয় ভাল্। হিটা মাইয়া ( এই বউটা )। হিলা চ্যাঙড়া ( এই ছোঁড়াগুলি )।

খ. 'এ্যায়' 'এ্যায়' প্রভৃতি সাধারণ অর্থ ছাড়াও সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয়।

গ. প্রথম পুরুষের 'তাস্‌মা'র মতো নিকট-নির্দেশক রূপে পাওয়া যায় 'ইস্‌মা' ( ইশ্‌মা ) এবং 'এস্‌মা' ( এশ্‌মা ), সম্ভ্রমার্থে। দু বচনেই এর ব্যবহার হয়। এ সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য প্রথম পুরুষের এই অংশের আলোচনাতে দ্রষ্টব্য।

ঘ. সম্ভ্রমার্থক 'ইম্‌রা', 'এম্‌রা' প্রভৃতি একবচন ছাড়াও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গ জানা না থাকলে এগুলোর বচন নির্ণয় দুরূহ হয়। যেমন : ইম্‌রা ক্যানে আইচে ( ইনি কেন এসেছেন, ক্রিয়ার সঙ্গে সম্ভ্রমার্থক 'ন' যুক্ত হয়নি )। এম্‌রা ক্যানে যায় নাই ( এরা কেন যাননি )। 'ইম্‌রা', 'এম্‌রা' নিশ্চিতরূপে সম্ভ্রমজ্ঞাপক বলে, অতঃপর ক্রিয়ার উত্তর আর সম্ভ্রমজ্ঞাপক 'ন' যুক্ত হয় না।

(খ) অপ্রাণিবাচক : ক্লীবলিঙ্গ

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| ইটা, এইটা, হিটা। হে, হি, হিখান। এইখান্, | এগিলা, এইগ্‌লা, এইলা। ইগ্‌লা, হিলা। এইকুনা। এও, ইয়াও। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. নিকট-নির্দেশক সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গের প্রায় সব ক'টি রূপ, —কি একবচনের কি বহুবচনের, —প্রাণিবাচক রূপেও পাওয়া যায়। এটিকে একটি বিশেষত্ব বলা চলে।

খ. নির্বাচিত উদাহরণ : হে কূলে ( এ পারে ) সায়েবের বেটা সাজনি সাজে, কাব্যে। হি পাখের ( এ দিকের )। হিটা আরো কি নাখা কাথা ( এটা আবার কেমন কথা )। ইয়াও ( এটি, ইতর প্রাণী ) ক্যামন মাছি, গোপীচন্দ্রের গানে। 'ইয়াও' ( এটি ) অপ্রাণিবাচকও রূপেও ব্যবহৃত হয় : ইয়াও ক্যানং বিহা ( এটা কেমন বিয়ে )। তেমনি, 'এইকুনা' অপ্রাণী ও প্রাণিবাচক দুইই হয় : এইকুনা পাইলা ( এই হাঁড়াটি ); এইকুনা মানুষি ( এই মানুষটি )। এইকুনা কাঁয় ( এটি কে ? )। হিলা জমি ( এই সব জমি ), হিলা মানুষি ( এই সব মানুষ )। এগিলা বা ইগ্‌লা কাথা ( কথা )। এগিলা বা ইগ্‌লা মানুষি॥

৬. দূরনির্দেশক সর্বনাম ( Remote Demonstrative : ও, উহা

(ক) প্রাণিবাচক : সাধারণ ও সম্ভ্রমার্থক :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| সাধারণ : অঁয়, অয়, অঁই। ওয়ার, ওঁয়ার, উয়ার, উঁয়ার, উঞার। সম্ভ্রমার্থক : অম্যা, অমা। অম্‌হয়া। উম্যা, উমা। উম্‌য়া, উমুয়া, হুম্‌য়া, হুমুয়া। অম্‌য়া, ওম্‌য়া। | সাধারণ : অয়, উয়ার প্রভৃতির পর যথারীতি 'ঘর' এবং 'লা' যোগ করে। সম্ভ্রমার্থক : এক বচনেরই রূপ ; এবং অম্‌হার, উমার, হুমার প্রভৃতির পর যথারীতি 'ঘর' এবং 'লা' যোগ করে। |

সাধু ও চলিত বাঙলায় দূরনির্দেশক সর্বনাম 'ও' বাঙলার বিভিন্ন উপভাষায় 'অ' হয়ে যায় ( ও. ডি. বি. এল্, পৃ. ৮০৯ )। সুনীতিকুমার দৃষ্টান্ত স্থলে পশ্চিম রাঢ় ও পূর্ববঙ্গের নাম করেছেন, কিন্তু আলোচ্য উপভাষার নাম করেননি। আলোচ্য উপভাষাতেও এটি ঘটে। 'ও' প্রথমে 'অ' হয়, এবং নিকট নির্দেশক সর্বনামের মতো যথারীতি বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়ে হয় 'অয়'। অপর দূরনির্দেশক সর্বনাম 'উ' আলোচ্য উপভাষায় মহাপ্রাণ-প্রবণতার ফলে হয় 'হু'; অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে 'উ'ও চলিত আছে। নিকট-নির্দেশক সর্বনামের মতো এখানেও সম্ভ্রমার্থক 'ন' 'ম' হয়, এবং মধ্যযুগের ও আলোচ্য উপভাষার রীতি অনুসারে এক বচনেরও সম্ভ্রম জ্ঞাপন করতেও বহুবচন প্রযুক্ত হয়। এর ফলে পাই : *উন> উম+রা=উম্‌রা, হুম্‌রা।

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. দূরনির্দেশক সর্বনামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় 'অয়' এবং 'উয়ার'। দ্বিতীয়ায় যথারীতি 'অক', মহাপ্রাণতার ফলে 'অখ'; ষষ্ঠীতে 'অর'। তেমনি, 'উয়াক', 'উয়ার' রূপ হয়। রঙপুর থেকে সংগৃহীত 'গোপীচন্দ্রের গানে' 'ওঁয়ার' এবং 'উঙার' রূপ মেলে : না থাকিম ওঁয়ার স্থাপে। অরঠে, উয়ারঠে ইত্যাদি প্রত্যাশিত রূপও চলিত আছে।

খ. নিকট-নির্দেশক সর্বনামের মতো দূরনির্দেশক সর্বনামেও প্রাণিবাচক রূপ পাই 'ওকনা', 'ওইকনা', 'ওকিনা', 'ওকেনা', 'ওইটা' প্রভৃতি। যেমন : ওকিনা মাইয়া ( ওই বউটি )। ওইকনা ছোয়া ( ওই ছেলেটি ) কার রে ? ওইটা মানুষি ( ওই মানুষটা )।

গ. এ উপভাষার নিয়ম অনুযায়ী সম্ভ্রমার্থক একবচনের রূপ বহুবচনেও চলে। সম্ভ্রমার্থে গ্রীয়ারসন্ 'উমরা'র সঙ্গে 'ওম্‌রা'র উল্লেখ করেছেন। আমরা পেয়েছি 'অম্‌হরা'। 'উম্‌রা'র আত্মস্বরে এবং অন্ত্যাংশে জোর পড়ায় 'হুম্‌রা' হয়েছে; কাব্যে প্রথমা বিভক্তিতে 'হুমুরা' এবং দ্বিতীয়াতে 'হুমাকো' পাই। এক ও বহু—দু বচনেই মেলে 'অমা', সম্ভ্রমার্থে।

(খ) অপ্রাণিবাচক : ক্লীবলিঙ্গ :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| ওইটা, হুটা। ওইখান্, ওইক্না, হুখান্ | ওইগিলা, ওইগ্‌লা, ওইলা, হুলা। |
| হো, হু। | |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. 'অক', 'উয়ার' ইত্যাদি প্রাণিবাচক দূরনির্দেশক সর্বনামগুলো ক্লীবলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। যেমন: ভাত যা আছিল্, অক খায়া মুই হাল বাড়ীত্ গেনু। অক দিয়া ঘর বানাইসে। জাহাত্ যেইখান্ আকাশত্ উড়েছে, উয়ার সগদ এ্যালগাড়ী নাই পারিবে (আকাশে যে জাহাজটি উড়ছে, তার সঙ্গে রেলগাড়ী পাল্লা দিয়ে পারবে না)।

খ. অন্যান্য উদাহরণ: কাব্যে পাই: হো পারে কাবরেঙ্গার গছ (ওপারে কামরাঙ্গার গাছ)। এইরকম 'হুপারে'ও মিলেছে। হুখান জমি (ওই জমিটা), হুটা জমি। ওইলা কাথা (ওইসব কথা)। হুলা আংসাং কাথা মোর আগত্ না কইস্ (ওইসব আজে-বাজে কথা আমার সম্মুখে বলিস না)॥

৭. সাকল্যবাচক সর্বনাম (Inclusive Pronouns):

ক. 'উভয়' এবং 'সকল'— সাধু ও চলিত বাঙলায় এই দুটি সাকল্যবাচক সর্বনাম এই উপভাষায় অচল। হিন্দী 'দনো', 'দোনো' আলোচ্য উপভাষাতে 'দুই' এবং 'উভয়'—উভয় অর্থেই চলে। যেমন: দনো হাতে ওয়া গাড়েছে (দুই হাতে ধানের চারা রোপণ করছে)। দোনো বইনি কাজাক করেছে (দুই বোনে ঠাট্টা তামাশা করছে)। কাব্যে ও কথ্য ভাষায়, উভয়ত্রই এটি ব্যবহৃত হয়।

খ. সাধু ও চলিত বাঙলার অপর সাকল্যবাচক সর্বনাম শব্দ 'সব' এই উপভাষায় 'সগ্', 'সোগ', 'সউগ', 'সৌগ' ইত্যাদি রূপে উচ্চারিত হয়। ঔষ্ঠ্যবর্ণের এই রকম কণ্ঠ্যবর্ণ হয়ে যাবার নিদর্শন এটিই একমাত্র নয়। 'সগ' শব্দের বিভিন্ন রূপ এই:

প্রথমা: সগ, সৌগ, সগায়, সোগায়।
দ্বিতীয়া: সগাক্, সোগাক্।
তৃতীয়া: সগাক্ দিয়া,—দি। সোগাক দিয়া, —দি।
চতুর্থী: দ্বিতীয়াবৎ।
পঞ্চমী: সগার, সোগার হাতে, —তে; —ঠে হাতে, —থাকি; —ঠে থাকি।
ষষ্ঠী: সগার, সোগার।
সপ্তমী: সগার, সোগারত্তি। সগার, সোগারটে, —ঠে।

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ঘোষ ধ্বনি অঘোষধ্বনিতে পরিণত হবার ফলে পাই 'সক', 'সোক' ইত্যাদি। জোর দেবার ফলে চলিত বাঙলার 'সব্বাই' ইত্যাদির মতো এখানেও মেলে 'সগ্‌গায়', 'সগ্‌গাক' প্রভৃতি। 'সব' এই বহুবচন শব্দটির উত্তরও আর একবার বহুবচনাত্মক প্রত্যয় 'ঘর', 'লা' যোগ করা হয় কচিৎ। যেমন, সগার ঘরক দিয়া ( সবাইকে দিয়ে ), সগলা মান্‌ষি ( সব মানুষ )। নিশ্চয়াত্মক রূপ : সোগায় ( সকলেই ), সগায়ে ( সকলেরই )।

গ. আরবী তামাম > তামান্ এই সাকল্যবাচক সর্বনামটি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষায় খুবই চলে। 'সগ'-এর মতো 'তামান'-এর উত্তরও 'গিলা', 'লা' যুক্ত হয় ( 'ঘর' নয় )। যেমন, তামানলা ( সবগুলি )। নিশ্চয়াত্মক রূপ : তামানে ( সবগুলিই ), তামানলায় ( সবই )। নিশ্চয়াত্মক 'ই' 'এ' হবার দরুণ পাই 'তামানে' ॥

...৯...

৮. সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ( Relative Pronouns ) :

(ক) প্রাণিবাচক : সাধারণ ও সম্ভ্রমার্থক : 'যে' শব্দ :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| সাধারণ : যাঞ, যাঞি। যায়, যাঁয়, য্যায়। | সাধারণ : যেইলা। যারঘর, যারলা। |
| সম্ভ্রমার্থক : যাম্‌রা। | অধুনা 'যারা'। সম্ভ্রমার্থক : এক বচনেরই রূপ ; এবং যাম্‌রাগুলা, —গিলা, —গেলা, —লা। যামারঘর। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. গ্রীয়ারসন্ 'যা' এবং 'ঝায়' রূপেরও উল্লেখ করেছেন। দুটোই রঙপুরের। 'ঝায়' স্পষ্টতঃই 'যায়' থেকে আগত, মহাপ্রাণতার ফল। 'যা' বিরল-চলিত।

খ. 'যাঞি' উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কম। বহুবচন বোঝাতে 'যারা'র ব্যবহার রঙপুর-কোচবিহারেই দেখা যায়, জলপাইগুড়ি-দার্জিলিঙে এ প্রয়োগ নেই। দ্বিত্ব প্রয়োগ করে বহুবচন নির্দেশ করবার প্রথা আছে : যাঁয়-যাঁয় ( যে যে )।

গ. সম্ভ্রমার্থক 'যাম্‌রা' এক এবং বহু—দু বচনেই চলে, এই উপভাষায় স্বাভাবিক রীতি অনুসারে। যেমন, যাম্‌রা আজি আইচ্চে ( যিনি আজ এসেছেন, সাম্মানিক 'ন' ক্রিয়ার পর যুক্ত হয়নি )। যামারঘর কালি চলি গেইল্ ( যাঁরা কাল চলে গেলেন )।

(খ) অপ্রাণিবাচক : ক্লীবলিঙ্গ : 'যাহা' শব্দ :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| য্যাও। যেই, যেইটা, যিটা। যেইখান্। | যেইগ্‌লা, যিগ্‌লা, যেইলা। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. 'যাাও'-এর প্রয়োগ বেশি মেলে না।

খ. 'যেই', 'যেইটা', 'যেইখান' প্রায় সমান ভাবেই মেলে, 'যিটা' অপেক্ষাকৃত কম চলিত। উদাহরণ : যেই দিনা ( যেই দিন )। যেইটা নাঙল ( যে লাঙলটি )।

গ. 'যা' এই প্রাতিপদিকের সঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির 'ক' যুক্ত হয়ে মেলে 'যাক'। যেমন দুটি প্রবাদ বাক্যে : যাক ( যা ) নাই শুনোঁ আপন কানে, তাক না পাইতাও গুরুর কওনে। যাক ( যা ) দিয়া ভাত খাইম, তাক না কওঁ ছ্যাকা।

ঘ. 'যেইগ্‌লা', 'যেইলা', 'যিগ্‌লা'র মধ্যে শেষোক্ত উচ্চারণটি অপেক্ষাকৃত কম। উদাহরণ : যেইগ্‌লা ধান ( যে ধানগুলি )। 'যেইলা' প্রাণী ও অপ্রাণিবাচক দুই রূপেই ব্যবহৃত হয়। যেমন, যেইলা মান্‌ষি ( যে সব মানুষ ), যেইলা ধান ( যে সব ধান )।

ঙ. এই উপভাষায় পারস্পরিক সঙ্গতিমূলক সর্বনাম (correlatives) সাধু ও চলিত বাঙলার মতোই কেবল উচ্চারণে কিছু আঞ্চলিক বিশেষত্ব দেখা যায়। উদাহরণ : যাঁর ভেল্‌লা মাটির মালিক, তাঁর ধনী ( যে অনেক জমির মালিক, সে ধনী )। যতখুন মুই ঘুরি না আইসোঁ, ততখুন তুই এটে নইস ( যতক্ষণ আমি ঘুরে না আসি, ততক্ষণ তুই এখানে থাকিস )। যেই চাহাবো, সেই পাবো ( যা চাইবি, তাই পাবি )।

…১০…

৯. প্রশ্নাত্মক সর্বনাম ( Interrogative Pronouns ) :

(ক) সাধারণ রূপ : 'কে' শব্দ :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| কাঞ, কাঞি, কাঁই। কার, কাঁর। | কারঘর, কারলা। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. কচিৎ কাব্যে 'কারে' এবং স্বরধ্বনিতে জোর পড়ায় 'কাহে' মেলে। যেমন : কাহে দিবে ( কে দেবে )। কারে আর হাঁকাবে পাখা বগলত্ বসিয়া ( কে আর পাখা দিয়ে বাতাস করবে পাশে বসে )।

খ. গ্রীয়ারসন্ উল্লিখিত 'কাঁ'র প্রয়োগ খুবই কম।

গ. অন্যান্য উদাহরণ : কার আইচ্চে ( কে এসেছে )। কাক ( কাকে ), কারঠে ( কার কাছে )। কারঘর ( কারা )। 'কারলা', 'কাল্‌লা' রূপে উচ্চারিত হয়। দ্বিত্ব প্রয়োগ করে বহুবচন করা হয়। বাঙলা ভাষার সাধারণ নিয়ম অনুসারে : কাঁর কাঁর যাবে ( কে কে যাবে ); সম্ভ্রমার্থে : কাঁর কাঁর যাবেন।

ঘ. এক বচনের রূপ 'কাঁর' দিয়েই বহুনাঃ বহুবচন জ্ঞাপন করা হয়।

ঙ. প্রশ্নসূচক সর্বনামের গৌরবার্থক রূপ এই উপভাষাতে অচল।

(খ) অপ্রাণিবাচক : ক্লীবলিঙ্গ : 'কি' শব্দ :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| কি। কিটা। কোন্‌টা, কন্‌টা, কুন্‌টা। | কোন্‌গুলা, —গিলা, —গেলা, —লা। |
| কোন্‌খান, কন্‌খান, কুন্‌খান। | কুন্‌গুলা, —গিলা, —গেলা, —লা। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. কাব্যে ও কথ্য ভাষায় 'কি' সমানভাবে মেলে।

খ. কাব্যে ও কথ্য ভাষায় 'কিটা' অনেক সময়েই পাওয়া যায়। যেমন, কিটা রে ?

গ. 'টা' 'খান' প্রভৃতি পদাশ্রিত নির্দেশকগুলি প্রশ্নসূচক সর্বনামের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়, সাধু ও চলিত বাঙলার রীতি অনুসারে বিশেষ্যের পর নয়। যেমন : কন্‌টা বাঁটা (কোন্ পথটি)। অখণ্ড বস্তু বোঝাতেও 'খান্' ব্যবহৃত হয় : কুনখান কাপ্‌ড়া (কোন কাপড়টি)।

ঘ. বহুবচন নির্দেশের ক্ষেত্রে : কুনলা কাথা (কোন কথাগুলি), বা কোন্‌লা ধান। এরই পাশে পাশে চলে : কন্‌ ধানলা, কুন কাথালা।

ঙ. 'কেন' এই প্রশ্নসূচক সর্বনামটি 'ক্যানে' এই রূপ নেয়, বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলেই তা হয়, যেমন রাঢ় বঙ্গে। আর একটি রূপ পাই এ উপভাষায় 'কিতায়'। এটি শ্রীহট্টেও মেলে। 'ক্যানে' কথ্য ভাষায়, 'কিতায়' কাব্যে, অধিক ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ : মোক ডাকালো ক্যানে (আমাকে ডাকলি কেন)। কিতায় রে তুই নাই আসিলো (কেন রে তুই এলি না)॥

…১১…

১০. অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম (Indefinite Pronouns) :

(ক) প্রাণিবাচক : 'কেহ' শব্দ :

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| কাঁহো। কাও্যো, কাঁয়ো, কাডো। কাঁও, কাড, কাঁউ। | একবচনের দ্বিত্ব প্রয়োগ করে। |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপে উচ্চারণ করা হয়। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে 'কাঁও' পেয়েছি। রংপুর থেকে সংগৃহীত 'গোপীচন্দ্রের গানে' পাই 'কাঁউ'। 'গোপীচন্দ্রের গানে'ই দ্বিতীয়া বিভক্তিতে পেয়েছি 'কাকো' : কাকো (কাউকে) মারে চড়-থাবড়া বুড়ী, কাকো (কাউকে) মারে গুড়ি।

খ. নিশ্চয়ার্থক ও সংযোগমূলক অব্যয়ের সঙ্গে এদের এইরূপ মেলে: কাঁহয়না ( কেউই নয় )। কাঁহোকও না ( কাউকেই নয় )।

গ. 'কাঁহো'র বহুবচনের প্রত্যাশিত রূপ 'কাঁহোর ঘর' বা 'কাঁহোরলা' চলিত নেই। একবচনের রূপকেই দ্বিত্ব করে বহুবচন নির্দেশ করা হয়। উদাহরণ: কাঁয়ো কাঁয়ো ( কেউ কেউ ) পান-গুয়া খাছে।

ঘ. অনিশ্চয়সূচক সর্বনামের সম্ভ্রমার্থক রূপ প্রায় অজ্ঞাতই বলা চলে, আমরা পাইনি।

(খ) অপ্রাণিবাচক 'কিছু' শব্দ: সাধু ও চলিত বাঙলার 'কিছু' শব্দ এই উপভাষায় অচল। বিশেষণরূপে হিন্দীর 'থোড়া'; মধ্যযুগীয় বাঙলার 'গুটিক'; এবং দুইয়ে মিলে' 'থোড়ায়-গুটিক'; 'কণা' শব্দের সঙ্গে 'এক' যোগ করে 'কণেক'; অর্ধ শব্দের সঙ্গে 'এক যোগ করে 'আধেক'>'আদেক'; এবং দুইয়ে মিলে 'কণেক-আদেক' মেলে। 'থোড়ায়-থোড়ায়', 'কণেক-কণেক' ইত্যাদি দ্বিত্ব প্রয়োগ পাওয়া গেছে। 'কণেক-আদেক' রাঢ়-বঙ্গেও মেলে।

(গ) মিশ্র অনিশ্চয়ার্থক সর্বনাম (Compound Indefinite Pronouns): গঠনের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই, কেবল আঞ্চলিক উচ্চারণ ছাড়া। উদাহরণ: কাঁও না-কাঁও হিটা করিছে ( কেউ না কেউ এটি করেছে )। যে কাঁয় সেঠে যাবা পারে ( যে কেউ সেখানে যেতে পারে )। কাঁয় বা আইসেছে ( কেউ বা আসছে )। আর কাঁহো ওইঠে গেলে মুই ভাজাহু হয় ( আর কেউ ওখানে গেলে আমি তাকে প্রহার করতাম )॥

…১২…

১১. আত্মবাচক সর্বনাম (Reflexive Pronouns):

সাধু ও চলিত বাংলার 'নিজ' শব্দ অবিকৃতভাবে; এবং 'আপনি' শব্দ 'আপনে' ( তিন মাত্রিক উচ্চারণ ) বা 'আপোনে' রূপে এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ: মুই নিজে ওঠে গেছু। তবে, 'নিজে-নিজে' হয় 'নিজানিজি': ওমরা নিজানিজি হিথান কাজ করেন। তাঁয় আপনে হি কামটা করিসে ( সে নিজে বা নিজেই এ কাজটি করেছে )॥

…১৩…

১২. ব্যতিহারিক সর্বনাম ( Reciprocal Pronouns ):

ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনামের প্রয়োগেও বৈচিত্র্য-বিশেষত্ব নেই। তা সাধু ও চলিত বাঙলার মতোই। যেমন: উয়ামঘর আপনে-আপনে কাচাল মিটাইস্ ( ওরা আপনা-আপনি ঝগড়া মেটাল )। 'আপনা-আপনে' ( তিন মাত্রিক উচ্চারণ ) রূপও মেলে, দ্রুত উচ্চারণে সন্ধির আভাস পাই 'আপনাপনে'॥

…১৪…

১৩. অব্যয়যোগে বিভিন্ন সর্বনামের রূপ :

ক. সাধু ও চলিত বাঙলায় নিশ্চয়ার্থক অব্যয় 'ই' এই উপভাষায় 'এ', 'য়ে' 'র' বা রূপ নেয়। স্বরধ্বনিতে জোর পড়ায় 'এ' হয়ে যায় 'হে'। সম্বন্ধ ও সংযোগবাচক অব্যয় 'ও' তেমনি হয়ে যায় 'হো' এবং উচ্চারণের আঞ্চলিক বিশিষ্টতায় জন্তে 'ছ'রূপেও তা পাই। নীচে বিভিন্ন সর্বনামের নিশ্চয়াত্মক রূপ প্রদর্শিত হল।

খ. উত্তমপুরুষ : মুইয়ে, মুইহে ( আমিই )। মুহে ( আমিই )।

সংযোগমূলক অব্যয় : মোরো ( আমারও ), কাব্যে। মহ, মহো, মোহো ( আমিও )। বহুবচনে : হামরায় ( আমরাই )। হামরাও ( আমরাও )।

গ. মধ্যম পুরুষ : সাধারণ : তুইহে ( তুইই ) তুহে, তোহে ( তুইই ), কাব্যে। তোরে ( তোরই )। সম্ভ্রমার্থক : তমরায় ( আপনিই, আপনারাই )। সংযোগমূলক অব্যয় : তুইহো, তুইয়ো ( তুইও )। 'তহ' রূপও পাই। তমরাও ( আপনিও, আপনারাও )।

ঘ. প্রথম পুরুষ : সাধারণ : তাহে, তাঁয়ে ( সেই-ই )। সম্ভ্রমার্থে : তামরায় ( তাঁরাই )। তামারলারে, তামারলায়হে ( তাঁদেরই ) সংযোগমূলক অব্যয় : তাঁয়ও ( সেও )। তামারালারো, তামারলারহো ( তাঁদেরও )।

ঙ. নির্দেশক সর্বনাম : অয়হে ( সেই-ই, ওই-ই )। অরে ( ওরই )। যাহে ( যেই-ই )। তায়হে ( সেই-ই )। যারে ( যারই )। যাকয় ( যাকেই, সাধারণ )। কাঁহোয় ( কেউই )। সংযোগমূলক অব্যয় : অরও, অরো ( ওরও )। অহো, অহ ( ও-ও )। কাঁকোয় ( কাউকেও ) ইত্যাদি॥

·১৫·

১৪. সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ ( Pronominal Adjectives and Adverbs ) :

| মূল : | দেশবাচক : | কালবাচক : | পরিমাণবাচক : | সাদৃশ্যবাচক : |
|---|---|---|---|---|
| | —ত্, —ত্তি, —ত্তি, —খি, —টৈ, —ঠৈ। ক্রিয়াবিশেষণ | —বেলা, —লা, —খন, —সম্, —কে। ক্রিয়া-বিশেষণ | —ত্, —তম্, —ত্তি, —তো। —কুনা, —কনে, —লা, —মাপা। বিশেষণ | —মন্, —মুন, —নম্, —নং; -নাখা, —নাখান, —নান্, —নাখা-ত্তি, —মা ন ত্তি, —না ন্ ত্তি ন; —ধয়াণ, —দান, দোন, —দোম; ধয়াণত্তি, —দান্-ত্তি, —ধান্ত্তি; —বন্ধান। বিশেষণ |
| সে, সেই, ত্যা, ত, তে, ত্যা | সেটৈ, সেইঠৈ, সেত্তি, সেইত্তি, সেত্তি, সেখি | সেবেলা, সেলা, সেখন, সে স ম্, সেইসম্, তেত্কে (কাব্যে), সেলামে, সেলামি | তত, ততো, তত্তু; তেকুত্তি (ক্বচিৎ), ত্যাতো | সেইমন, সেমন, সেমুন, সে ন ম, সেনং; সেনাখা, সেনাখান, সেই-নান্, সেইনাখাত্তি, সেইনান্ত্তি, সেই-নান্ত্তিন্; সেই ধয়াণ, সেইদান, সেই দোন, সেই দোম; সে ই-ধ য়া ণ ত্তি, সেই দান্ত্তি, সে ই ধান্ত্তি; সেবন্ধান (কাব্যে)। |

| মূল : | দেশবাচক : | কালবাচক : | পরিমাণবাচক : | সাদৃশ্যবাচক : |
|---|---|---|---|---|
| এ, এই, এ্যাত্ ; ই, অ্যা ; হি, হে | এটে, এইঠে, এঠে ; হেটে, হেঠে ; এ্যাটে, ইঠে ; এতি, এইত্তি, এত্তি ; হিতি, হিত্তি, হিতত্তি (কাব্যে) ; ইতি, ইত্তি, ইত্তিকিনা, এথি এঠিখানা, এঠিকোনা। | এবেলা, এলা ; এলাও, এ্যালাই ; এলাহানে, এলানে, এলান, এলানি ; এলানেত্ ; হেখন, হিখন (কাব্যে) | অ্যাত্তো, এত্তো, এতয়, এ্যাত্লা, ইত্তিকুনা ; হেত্তো (কাব্যে)। | এইমন, এমুন, এইনম্, এইনং, এ্যানং ; এইনাথা, এই নাথান, এইনান, এই মাথাত্তি, এই মানত্তি, এই নাসতিন, এই ধরাণ, এই দান, এই দোন, এই দোম ; এই ধরাণত্তি, এই দানত্তি, এই ধানত্তি ; এ বন্ধান (কাব্যে)। |
| ও, ওই ; অ, উ, ত, ত্যা ; ঐ ; হো, হ্যা, হে | ওটে, ওইঠে, ওঠে ; হোটে, হোটত্ ; ওতি, ওইতি, ওত্তি ; হুতি, হুত্তি, হুততি (কাব্যে)। অতি, অত্তি, অট্টে। উতি, উত্তি, উথি, উঠি। ঐঠায়, ঐঠিখোনা, ঐঠিকোনা। | ওইসম্, হানসম্, হেম্সম্ (কাব্যে)। তহঘড়ি, তেনঘড়ি (কাব্যে)। ত্যানকালে। 'সেলা' এখানেও চলে। | অত্, অত, অত্তো, অতয়। অকনে, অনা। অত্লা, অত্তোলা, অতুলা। | ওইমন, ওইমম, ওইনং। ওইনাথা, ওইনাথান, ওইনান, ওই মাথাত্তি, ওই মানত্তি, ওই মানতিন। ওই ধরাণ, ওই দান, ওই দোন, ওই দোম। ওই ধরানত্তি, ওই দান্ত্তি, ওই ধান্ত্তি, ওইবন্ধান (কাব্যে)। |

| মূল : | দেশবাচক : | কালবাচক : | পরিমাণবাচক : | সাদৃশ্যবাচক : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| য, যি, যে, যেই, যেক্, যেত্, যৎ, য্যা, ঝে, ঝ্যা, ঝি | যেটে, যেইঠে ; যেতি, যে ত্তি, যেইতি। যিটে, যেন্তি। ঝিতি, ঝেটেই, যেঠেখানা, যেত্তিকোনা। | যেব্লা<যেবেলা, যেলা, ঝে লা। যেইসম্, যেত্কে, য্যালা, য্যা ন-কালে ; যেনঘড়ি, যৎঘড়ি | যত, যতো, যতয়, য্যাতো, যেকতি, যয়মালা | যেইমন, য্যামন, য্যানম্, য্যা নং, যেই নং, ঝ্যানং। যেইনাখান, যেই-নান, যেইনাখাতি, যেই নানতি, যেই নানতিন। যেই ধরাণ, যেইদান, যেইদোন, যেই-দোম। যেই ধরা-ণতি, যেই দান-তি, যেই ধানতি। যে বদ্ধান (কাব্যে) |
| ক, কি, কু, কেই, কো, ক্যা | কোন্টে, কোন্-ঠে, কোটে, কোট-ত্, কটে, কো-টেই ; কুঠে, কুন-ঠে, কত্তি, কুতি, কুত্তি। কোন্ঠে-খানা, কু ন ঠি-কেনা | কোন্বেলা, কুন-বেলা, কোন্সম্, কুন্সম্ | কতো, কতয়, ক-তোলা, কতুলা, কত্লা, কেত্লা | কেইমন, ক্যামন, ক্যানম্, কেইনম, ক্যানং, কেইনং, কিমান্, কিনান্-তি, কিনান্তিন ; কিনাখা, কিনাখান কিনাখাতি, কিধ-রাণ, কেইদান, কি-দান, কিদোন, কি-দোম। কিধরা-ণতি, কিদানতি, কিধানতি ; কাং-কা, ক্যাং কা, ক্যা ম্ বা, কেং-কাতি, কিরং, কি-বদ্ধান ( কাব্যে ) |

| মূল : | দেশবাচক : | কালবাচক : | পরিমাণবাচক : | সাদৃশ্যবাচক : |
|---|---|---|---|---|
| ক, কো, কু | কোনোঠে, কুনোঠে | কখনও | 'অনেক' শব্দই এখানে ব্যবহৃত হয়। | কুনো মতে |

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥

ক. দেশবাচক সর্বনামীয় ক্রিয়াবিশেষণের বেশির ভাগই এসেছে 'ঠাঁই' শব্দ থেকে। 'ঠাঁই' থেকে—টৈ,—ঠে,—থে,—থি,—তি প্রভৃতি। 'তি'র দ্বিত্ব হবার ফলে পাই 'ত্তি'। নির্দেশক 'এ', 'ও' যথাক্রমে হয় 'হে' এবং হো; তেমনি 'ই' হয় 'হি', 'ই' অবিকৃত রূপেও মেলে। উদাহরণ: হেটে (এখানে), হোটে (ওখানে), ইত্তি, হিত্তি (এখানে), 'হিতত্তি' (এখানে, কাব্যে)। 'হেতি', হেত্তি, হিতি, হিত্তি (এখানে)। নির্দেশক 'উ' তেমনি হয় 'হু': হুত্তি, হুত্তি (ওখানে)। কুতি, কুত্তি (কোন্‌খানে)। 'ঠাঁই'-এর পরও স্থানবাচক 'খানা' ব্যবহৃত হয়: ঐঠেখানা, কোনঠেকোনা, ইত্তিকিনা, প্রভৃতি।

খ. কালবাচক সর্বনামীয় ক্রিয়াবিশেষণগুলোর মধ্যে 'বেলা', 'সময়' এবং 'ক্ষণ' প্রধান। 'বেলা' থেকে 'লা'। 'এবেলা' থেকে 'এলা, 'সেবেলা' থেকে 'সেলা'। বাঁকা উচ্চারণ ও বিভক্তি যুক্ত হবার ফলে পাই এ্যালায়, স্যালায়। সময়বাচক 'এখন,' 'এখনে' যুক্ত হবার জন্যে মেলে 'এলানে', 'সেলানে', মহাপ্রাণতার ফলে 'এলাহানে', 'সেলাহানে'; তারপর 'এলানি', 'সেলানি'। এলা, সেলা-র সঙ্গে বিভক্তিরূপে 'ও' ব্যবহৃত হয়ে হয় এলাও, এ্যালাও, সেলাও, স্যালাও। অব্যয় রূপেও 'ও' যুক্ত হয়ে থাকে। তখন এলাও (এখনও), সেলাও (তখনও)। 'সময়' থেকে 'সম্‌' পাওয়া যায়: হেম্‌সম (হেনসময়ে), হ্যান্‌সম্‌; এ প্রয়োগ কাব্যেই দেখি কেবল। কালবাচক অধিকরণের 'ক' মেলে কখনও: যেত্‌কে (যখন), তে-তকে (তখন),—এও কেবল কাব্যেই চলে। 'ঘটিকা' থেকে 'ঘড়ি' মেলে: যৎঘড়ি, তৎঘড়ি, তেনঘড়ি।

গ. পরিমাণবাচক বিশেষণ 'ত' চলিত বাঙালার মতো এখানেও 'তো' হয়। অন্যান্য আঞ্চলিক বিশেষত্ব হল, তু (ততু), তি (তেকৃতি, সেইপরিমাণ। 'তাক্‌' অর্থাৎ এ উপভাষায় 'সে', তা থেকে 'তেক্‌'+তি)। 'এতো' এখানে 'এতয়'; সম্ভবতঃ 'এতই'-এর পেছনে আছে। এইরকম 'অতয়', 'যতয়' 'কতয়', যথাক্রমে 'অতই', 'যতই' ও 'কতই'-এর সঙ্গে যুক্ত। 'এতো'র মহাপ্রাণিত রূপ 'হেত' (হেতো)। বহুবচনাত্মক প্রত্যয় 'লা' ('গুলা') পরিমাণ জ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। এতলা, কতলা, যতলা প্রভৃতি তার উদাহরণ। 'ততু'র সাদৃশে, কতুলা, যতুলা, এতুলা। শ্বাসাঘাতের জন্যে তেমনি মেলে এত্‌লা (এ্যাত্‌লা) কত্‌লা (কেত্‌লা। হিন্দী প্রভাবে অথবা 'এ্যাত্‌লা'র সাদৃশ্যে)। পরিমাণবাচক 'কণা',

( 'অন্ন' অর্থে ) পাওয়া যায় : ইত্তিকুনা, অনা, অকনে প্রভৃতি। আর একটি শব্দ 'মালা'। যেমন, 'যয়মালা' অর্থাৎ 'যতটুকু'। প্রত্যাশিত 'এতমালা', 'কতমালা' পাইনি বলে উল্লেখও করিনি, তবে থাকা অসম্ভব নয়। এটি রঙপুরে পাওয়া গেছে। 'যেকৃতি', 'তেকৃতি' প্রভৃতি মূলতঃ কাব্যের, তবে কোচবিহারের কথ্য ভাষাতেও মিলেছে।

ষ. সাদৃশবাচক বিশেষণগুলির মধ্যে আছে : মতন>মন। ধরণ>ধারাণ ; ধরণ+তি=ধারাণতি, ধান্‌তি, দান্‌তি। রকম>নকম>নঅম>নম্‌, নন্‌, নং। 'নং' থেকে 'ঙ্গুং' তেমনি, রকম+তি, তিন>নান্‌তি, নান্‌তিন। লগ+আল, ত্তি>নাকান, নাথান, নাথা, নাথাতি, নাথিতি। মধ্যযুগীয় কাব্যে পাওয়া যায় বন্ধন>বন্ধান : এবন্ধান কিবন্ধান, ইত্যাদি। মহাপ্রাণিত রূপ : হিমন হিনং, হিঙ্গুং, হিনাথা। হেনং, হেঙ্গুং, হেনাথা। হুমন, হুনং, প্রভৃতি ॥

॥ গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জী ॥

G. A. Grierson : Notes on the Rangpur Dialect (Journal of the Asiatic Society of Bengal : Vol. XLVI, Part I, No. 3, 1877, PP. 186—226).

G. A. Grierson : Linguistic Survey of India (Vol. V, Part I, PP. 163—166).

B. H. Hodgson : Miscellaneous Essays (Vol. I, London : 1880).

S. K. Chatterjee : The Origin and Development of the Bengali Language (George Allen and Unwin : 1970).

C. C. Sanyal : The Rajbansis of North Bengal (Asiatic Society, Calcutta : August, 1965. PP. 250—263).

Dr. Shashi Bhusan Dasgupta : A descriptive catalogue of Bengali Manuscripts preserved in the state library of Cooch Behar (1948).

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী : রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১৩১২, প্রথম সংখ্যা )।

সত্যস্বরূপ বাজ : কোচ ও রাজবংশী শব্দ সংগ্রহ ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১৩১৫, চতুর্থ সংখ্যা )।

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ : কামতাবিহারী ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১৩১৮, চতুর্থ সংখ্যা )।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত : কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৮, চতুর্থ সংখ্যা ) ।

যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী : রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ ( রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১৩২৫, প্রথম—চতুর্থ সংখ্যা ) ।

ব্রজচন্দ্র মজুমদার প্রকাশিত : রাজকৃষ্ণদাস বৈরাগীর 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য (১৩০৬ সালে মুদ্রিত । )

পঞ্চানন সরকার সম্পাদিত : কবি দ্বিজ কমললোচন প্রণীত 'চণ্ডিকাবিজয় কাব্য' ( রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী : আশ্বিন, ১৩১৬ ) ।

চম্পাবতী কইনার পালাগান : প্রথম খণ্ড [ রঙপুরের উপভাষায় রচিত ] (লোক-সাহিত্য : প্রথম খণ্ড । বাঙলা একাডেমী, ঢাকা । আষাঢ়, ১৩৭০ ) ।

ডঃ মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ সম্পাদিত : পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ( তিন খণ্ড । বাঙলা একাডেমী, ঢাকা । ১৩৭২ ) ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মণ : রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস [ ভাষাখণ্ড ] জলপাইগুড়ি । ( ১৩৬১ ) ।

শ্রীকলীন্দ্রনাথ বর্মণ : রাজবংশী অভিধান ( শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙ । ১৯৭১ ) ।

# ত্রিপুরার কক-বরক প্রবাদ-প্রবচন

শ্রীজগদীশ গণচৌধুরী

**ভূমিকা ১.**

গত ১৯৭১ সালের ভারতের আদমশুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরারাজ্যে প্রায় ষোল লক্ষ লোকের বাস। এঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ উপজাতি, অবশিষ্টরা বাঙালী ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক। ভারত সরকারের স্বীকৃতি অনুযায়ী ত্রিপুরার ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। এই ১৯টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্মী, মঘ ও চাকমারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন পার্বত্য-চট্টগ্রাম-আরাকান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে। ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া জমাতিয়া, রিয়াং, উচাই, হালাম, ছইমল, গারো, লুসাই ও কুকি--এঁরা ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণের অরুণাচল ও আসাম এলাকা ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে সরতে সরতে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য, বাংলাদেশ ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বসতি বিস্তার করেন। মোটামুটিভাবে এককথায় এঁদের দক্ষিণীয় বড়ো বলা হয়। তাঁদের জাতিগোষ্ঠী আসামের উত্তর লখিমপুর, গোয়ালপাড়া, কামরূপ দারাং, উত্তরকাছাড়, পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি এবং নেপালের মোড়াং—এসব অঞ্চলে আছেন যাদের উত্তরীয় বড়ো নামে অভিহিত করা হয়। পূবদিক থেকে অহমদের আগমনের আগে বৃহত্তর বড়ো জাতই ছিলেন আসামের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জাতি। অহম্‌দের হাতে পরাভূত বড়ো জাতি শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরতে থাকেন। অস্ট্রিক জাতীয় যে কিছু সংখ্যক খাসিয়া এরাজ্যে আছেন তাঁরা আপাততঃ আসাম-মেঘালয় থেকে এসেছেন। সাঁওতাল, ভিল, ওরাঁও এবং মুণ্ডাদের আনা হয়েছে পশ্চিম-বাংলা, বিহার প্রভৃতি এলাকা থেকে, এখানকার চা-বাগান, পৌর-প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য। ভুটিয়া ও লেপ্‌চাদের সংখ্যা নগণ্য, তাঁরা নেপাল-সিকিম-ভুটান এসব এলাকা থেকে এসেছেন।

সকল দেশের পাহাড়ে, জঙ্গলে, পল্লী অঞ্চলে বাস করা, লেখাপড়া না-জানা, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের মুখে মুখে একটা অলিখিত সাহিত্য গড়ে ওঠে, যার বিষয়বস্তু হল ধাঁধাঁ, উপকথা, রূপকথা, লৌকিক কাহিনী, প্রবাদ-প্রবচন, গান, ছড়া। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়েরও একটা লোকসাহিত্য থাকবে। ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, উচই, হালাম, ছইমল, গারো, লুসাই, কুকি—এঁরা বংশে, সংস্কৃতিতে ও ভাষায় একে অপরের থেকে খুব দূরের নন। তাঁদের ভাষাকে কক-বরক বলা হয়। কক-বরক ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনের আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। প্রবাদকে কক-বরকে বলা হয় ককনি ত্রাম বা বাক্য।

...২...

অন্যান্য ভাষায় প্রবাদবাক্যের যেসব বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ, উদ্দেশ্য, কক-বরক প্রবাদেও সেসব রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য ভাষায় প্রবাদের ন্যায়, কক-বরক প্রবাদও সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ, সরস, তথ্যনির্ভর, সহজবোধ্য, সহজপ্রয়োগযোগ্য, বাস্তব ঘেঁষা ও নৈর্ব্যক্তিক। প্রবাদে যে জ্ঞান, চিন্তাধারার প্রকাশ হয়, তা কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, গোটা সম্প্রদায়ের; সে জ্ঞান পুঁথি পড়া বিদ্যা থেকে আহৃত নয়, পারিপার্শ্বিক বনজঙ্গল, নদ-নদী, পাহাড়, জুমচাষ, সামাজিক জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে তিক্তমধুর অভিজ্ঞতালব্ধ। প্রবাদবাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সুস্থ, সুন্দর, পরিপাটি সাংসারিক জীবন-যাপন করার জন্য জ্ঞানদান। তাই দেখা যায় কোন প্রবাদবাক্য বিপদে অভয় ও ভরসা দিচ্ছে; উন্নতিলাভের পথ বাতলিয়ে দিচ্ছে; কোন প্রবাদ বিপদের পূর্বাভাষ দেয়; কোন কোন প্রবাদে থাকে লোকচরিত্র চিনে নেওয়ার ইংগিত এবং তদনুসারে ব্যবহার করার নির্দেশ, অলস, অসৎচরিত্র, আড্ডাবাজ, কৃপণ, ভবঘুরে, বাক্‌সর্বস্ব লোকের প্রতি ঘৃণা, নিন্দা প্রকাশ পায় কোন কোন প্রবাদে; যেমনি কর্মঠ, সৎচরিত্র, দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রশংসা করার মনোভাবটিও প্রবাদবাক্যে প্রতিফলিত হয়।

...৩...

সবভাষাই তার পারিপার্শ্বিক জগৎ, পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ, পেশাবৃত্তি, লোক-চরিত্র, প্রতিবেশী অন্যজাতির সংস্কৃতি-স্বভাব, ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচারানুষ্ঠান, জলবায়ু, আবহাওয়া, ঋতু পরিবর্তন,ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে প্রবাদের তথা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। কক-বরক ভাষার বেলাও তাই হয়েছে। অথচ খতিয়ে দেখলে এর দীনতা, অপূর্ণতা স্পষ্ট বুঝা যায়। এর কারণ একাধিক। কক-বরক ভাষাভাষীদের আদি সংস্কৃতি মুখ্যতঃ জুমচাষ-কেন্দ্রিক; বনজঙ্গল, নদনদী, ঝরণা, পাহাড়-পর্বত, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও পরস্পর বিবদমান উপজাতি নিয়েই তাঁদের পরিবেশ গঠিত; দেশবিদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক জীবন ও কলকারখানার কাজকর্ম প্রভৃতির অভিজ্ঞতা তাঁদের এতদিন ছিল না; পার্শ্ববর্তী প্রদেশের বাঙালীদের সাথে সম্বন্ধের ইতিহাসে প্রাচীনত্ব আছে, কিন্তু গভীরতা ও ব্যাপকতা সম্প্রতিকালের।

পারিবারিক ও সম্বন্ধ, হাসিকান্না কক-বরক প্রবাদের উপকরণ যোগাতে সাহায্য করেছে মায়ের আদর, স্নেহ, ভালবাসায় মুগ্ধ সন্তানদের মুখের বুলি:

| | |
|---|---|
| রাংচুক কিতিং কুরই, | টাকার মতো গোল আর কিছু নেই, |
| সুকইচুক কিতিং কুরই, | থিলার মতো মসৃণ আর কিছু নেই, |
| সালচুক কুচুং কুরই, | সূর্যের মতো তেজী আর কিছু নেই, |
| মা-নি ছুধ চুক কুতই কুরই॥ | মায়ের দুধের মতো মিষ্টি আর কিছু নেই। |

| | |
|---|---|
| ভালস্থ কিত্তিং কুরই ; | চন্দ্রের মতো গোল আর নেই ; |
| সালস্থ কিত্তিং কুরই , | সূর্যের মতো গোল আর নেই ; |
| মুষ্ঠমুপুরি ফাইপুর দিন ; | মানব জন্ম পেয়েছিলাম ; |
| মা-স্থক কাহাম কুরই ॥ | মায়ের মতো ভাল আর কিছু নেই ॥ |

কিন্তু বউ-এর সোহাগে মাকে অবহেলা করাটা বাস্তব সংসারের ঘটনা, এদৃশ্য দেখে দুর্মুখ পাড়াপ্রতিবেশীর ব্যঙ্গোক্তি :

| | |
|---|---|
| মাল ইয়াক কারঐ হিকন খুলুম | মাকে ছেড়ে বউকে প্রণাম |
| হিক মাইয়া মাংখা, | বউ ছিল না, এখন এল ; |
| ভাবুক মানক খিবিকা ॥ | মাকে ছেড়ে দেওয়া হল ॥ |

এরূপ স্ত্রৈণ ছেলের প্রতি মায়ের খেদোক্তি :

| | |
|---|---|
| নম বুরুই ব রুথা, | তোমাকে বউ এনে দিলাম, |
| নক-ব রুথা, | ঘর-বাড়িও দিলাম, |
| নং তাংগই আন খিবই রুথা ॥ | তবুও তুমি আমাকে অশ্রদ্ধা করছ কেন ? |

অতএব সুন্দরী বউ না আনাই ভাল :

| | |
|---|---|
| বুরুই কচাক তানাদি, | সুন্দরী বউ বিয়ে করো না, |
| সাক কচম নাই কাইজাকদি । | কালো মেয়ে বিয়ে কর । |
| থাইপ্রক খিতারই মাইবরদি । | জমিতে চালিতা ফেলে ধান রো । |
| নকলা বাজার কাইদি । | ঘরের আশেপাশে বাজার বসাও । |
| আ কতর তা চাদি, | বড় মাছ খেয়ো না, |
| আ চিকণ পাইয়ই চাদি ॥ | ছোট মাছ পেলে খাও ॥ |

মা-বাবার চোখে নিজের ছেলে বা মেয়ে ভাল ; যত দোষ পরের ঘর থেকে আনা বউ বা জামাই-এর । তাই মা-বাবার মন্তব্য :

| | |
|---|---|
| চামারই হামকাইচে সাজুক, | জামাই ভাল হলেই তো কন্যা ভাল থাকবে, |
| হামজুক হামকাইচে সাজ্‌লা ॥ | পুত্রবধূ ভাল হলেই তো ছেলে ভাল থাকবে ॥ |

কাজেকর্মে, স্বভাব-চরিত্রে নিজের কন্যার সাথে পুত্রবধূর কি তুলনা হয় ! তাই মায়ের উক্তি :

| | |
|---|---|
| হাচুকণি বচুক সাজুক, | পাহাড়ের শিমুলগাছ হল কন্যা, |
| হারকণি বচুক হামজুক ॥ | সমতলের শিমুলগাছ হল পুত্রবধূ ॥ |

কলির অধিকাংশ বউ তো ঘর-ভাঙানী, সব সময় তারা চুপ করে থাকতে পারে ? তাদের মনের কথাটি :

কয়া থুইকা কাই আং হামজাগ মানি,
থুই থাংকা কাই গাইরিং সাকাওন কাওনই আওয়াম চানানি ॥

— শ্বশুর মারা গেলে আমি পরম সুখে থাকব,
শাশুড়ী মারা গেলে টংঘরে বসে পিঠা খেতে পারব ॥

ঠাকুরঝিকে যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করা যায় ততই মঙ্গল :

| | |
|---|---|
| পাংরং পাংনাইনি সুংক্লাই রহকাই | দেবর/ঠাকুরঝিকে আলাদা/বিদায় করে |
| আং সাইস্নং তংনাই | দিতে পারলে আমি একা সুখে থাকব। |

কিন্তু দাম্পত্যজীবনে অন্তরায় শুধু শ্বশুর, শাশুড়ী বা ঠাকুরঝিই নয় ; বোকা পৌরুষত্বহীন স্বামীও :

| | |
|---|---|
| ফাতার-নি তকজুকছা, | বাইরে হল মুরগি, |
| নগনি তগলা, | ঘরে মোরগ, |
| ফাতার-অ মুখাং মানিয়া ॥ | বাইরে মুখ নাই ॥ |
| নগ থাং [illegible] তগলা, | ঘরে মোরগ, |
| ফাতার-অ সুই [illegible] তেসা ॥ | বাইরে কুকুর ॥ |

হাসি-কান্নায় সুখে-দুঃখে, [illegible] মাঝখানে চলে দাম্পত্যজীবন স্ত্রীর মুখে কখনও কখনও শোনা যায় :

| | |
|---|---|
| নন নাইচিংগই চুপাই মাই চাইয়া , | তুমি আনানি বলে ভাত খাইনি, |
| মাইচু [illegible]য়াগ তুইমু তুংমু, | মোটাভাত হাতেই রেখে দিয়েছি, |
| দাখা ইয়াগ তুইমুং তুইমুং, | জলে ভর্তি কুঁজো হাতেই রয়েছে, |
| মকল তকুরুই সুক তখা ॥ | তোমার দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ ফুলে গেছে ॥ |

সতীনের জ্বালা বড় জ্বালা। যুবতী [illegible] পেয়ে বয়স্কা বউকে অবহেলা অনেক পুরুষই করে। তাই বুড়ো সতীনের মনের কথা :

| | |
|---|---|
| ওয়াকংসানি ফেকং নই [illegible], [illegible] গরবই মা[illegible] ॥ | একটা বাঁশ চিরে দোভাগ হল আর জোড়া আগে লাগবে না। |
| [illegible] মি [illegible] চুবা ॥ | ছিলাম পাটরাণী, এখন [illegible] পরিষ্কার করাই আমার কাজ। |

ককবরক প্রবাদের আরেকটি উপকরণ হল পোষ্য পুত্র ও ঘরজামাই :

| | |
|---|---|
| চর লে হামিয়া ॥ | দেহে প্রবিষ্ট কাটা মাংস রূপান্তরিত হয় না ॥ |
| ইয়াকানি বাননন বাখা চারুক | হাতের মাংস কেটে খাওয়ালেও, |
| কস্তপুত্রনি বিশ্বাস কুরুই ॥ | পোষ্যপুত্রকে বিশ্বাস করতে নেই ॥ |
| চানা ন সময়-অ চানানি মাইয়া | খাবার সময় খেতে চায় না, |
| ওল নাইতুগই মানিয়া ॥ | পরে খুঁজেও পায় না ॥ |
| বুইনি বুমান থানাতই নাতই | পরের ছেলের মন জোগাতে জোগাতে |
| তকতই জুথুকমা পাইখা ॥ | সব ডিম শেষ হল ॥ |

মানুষ সামাজিক জীব। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সমাজে একে অপরের উপর নির্ভরশীল :

বল-নি আচ্ড়া ওয়া, শুকনো বাঁশের ভরসায় কাঁচা বাঁশ,
ওয়া-নি আচ্ড়া বল ॥ কাঁচা বাঁশের ভরসায় শুকনো বাঁশ ॥

তাই যতটা সম্ভব মিলেমিশে থাকা উচিত। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা করে বেশি মেলামেশা পরিণামে ক্ষতি ডেকে আনে। তাই সাবধান :

লোক হোয়াগ্যা মরে যে অতি বেশি মেলামেশা করে সে গরিব হয়ে যায়,
গিরস্তি হোয়াগ্যা তরে ॥ যে গৃহস্থালীকে ভালোবাসে সে উতরে যায় ॥

মারামারি, মামলাবাজি নিজেরই ক্ষতি করে। এসব এড়ানোই শ্রেয়। তাই উপদেশ :

দরবার তা কাদি, মামলা-মোকদ্দমায় পা ফেলবে না,
খিলিং কাছি ॥ বরং বিষ্ঠায় পা ফেল ॥

এমনকি জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্ত তোড়জোড় যা আজকাল চলছে, এর প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বহু আগেই উপলব্ধি করেছেন :

তাথুকমিনি-নি বুখা আচুকণ খামপ্রই মানিয়া, সাত সন্তানের মা বসার পিঁড়ীটিও
কাইসানি বুখা চা-অঐ পাইয়া ॥ পান না, এক সন্তানের মা খাবার
মিলক সকচিব চাপুংগিয়া, খেয়ে ফুরাতে পারে না। লাউএর
মিলক সকচাব চা চাগিয়া ॥ একটা আধমরা ডগা মাচা ছাইয়ে ফেলতে পারে না আবার লাউ-এর একটা মোটাসোটা ডগার জন্তই মাচায় স্থান সঙ্কুলান হয় না।

কোনো কোনো মানুষের কুৎসিত স্বভাবের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি কালক্রমে প্রবাদের রূপ পেয়েছে

খিতুং বায়া = লেজ বেটে, ধূর্ত লোক।
ইয়াকুং বলক = পা লম্বা, ভবঘুরে।
মকল কতর = চোখ বড়, লোভী।
মুখাং ক্রাক = মুখ শক্ত, নির্লজ্জ।
ইয়া কলক = লম্বা হাত, চোর।

গৃহস্থালির নিত্যব্যবহৃত জিনিস থেকেও কক-বরক প্রবাদের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। যেমন :—

রিপ্রই-অ রাংচাক তোংগ ॥ ছেঁড়া নেকড়াতেও সোনা থাকতে পারে ॥
খেয়াং লাপ্রই সামুং চুকব ॥ যত্নে রাখা ছেঁড়া পাতাও সময়ে কাজে আসে ॥

| | |
|---|---|
| হর চুং থামি বল খিচং ॥ | অনন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি ॥ |
| দাময়া হুকতাং | পুরোনো দা কাজ করে, |
| চেকরা মুং তাং ॥ | কাঁচি নাম করে ॥ |

বাঙালী ও কুকি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে—

| | |
|---|---|
| ওয়ান্‌জই কক শ্রেক ককইয়া, | ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলা বাঙালীর স্বভাব, |
| সিকাম লাম শ্রেক ককইয়া ॥ | পথ গোপন করা কুকির স্বভাব ॥ |
| হালাম-নি মাই কাহাম, | কুকির ভাত ভাল, |
| ওয়ান্‌জই-নি মুই কাহাম ॥ | বাঙালীর তরকারি ভাল ॥ |

রামায়ণ, মহাভারত, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকেও প্রবাদের উপকরণ আহৃত হয়েছে—

| | |
|---|---|
| রাবণ হামতই হামকা, | রাবণের মতো অহঙ্কারী |
| লংকা লকনানি নাইখা। | লংকা পুড়ে ছারখার হতে চলল। |
| কুম্ভকর্ণা থুতই থুকা | কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম। |
| রাবণনি লংকা থামই থাইবাইখা | রাবণের লংকা পুড়ে ছারখার হল |

ভাই লক্ষণ।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

| | |
|---|---|
| ভারত পথি পড়িনা মান, | মহাভারত পড়া যায়, |
| কপাল পড়িনা মাইয়া | কপাল পড়া যায় না। |
| দোল-নি ফাইঐ মাইনাই ফাইদি, | দোলোৎসব দেখে এসে ধান দেখ, |
| অসা-নি ফাইঐ খুলনাই ফাইদি ॥ | দুর্গাপুজো দেখে এসে কার্পাস দেখ ॥ |

ব্রহ্মার কলম।

এখানকার হাটে, মাঠে-ঘাটে, অফিসে, আদালতে, বিদ্যালয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষা-ভাষীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে মেলামেশার ফলে স্থানীয় উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলাভাষাও জানেন, বলেন, লেখেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বাংলাভাষা থেকে শব্দ, ধাঁধা, প্রবাদ, রূপকথা, গান, ভাবধারা অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে আহরণ করে কক-বরকের শব্দভাণ্ডার ভরে তুলছেন ; সঙ্গে সঙ্গে ভাষাটিও হয়ে উঠছে সমৃদ্ধশালী, যুগোপযোগী, গতিশীল এবং এই ভাষা-ভাষীদের চিন্তায় আসছে গভীরতা ও ব্যাপকতা। সে যাই হোক, অসংখ্য বাংলাপ্রবাদ আজ কক-বরক প্রবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে, যেমন—

অতি চালাকের গলায় দড়ি।

অভাবে স্বভাব নষ্ট।

আগে তিতা, পাছে মিঠা।

উচিত কথার ভাত নাই।

এক মুখে দুই কথা।

কষ্ট করলে কৃষ্ণ মিলে

টাকা থাকলে বাঘের চোখও মিলে!

তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

শ্বাপদ-সংকুল বন্য-জংলী পার্বত্য পরিবেশে বাস করে বলে এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ, মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, লাম্পট্য, প্রেম-কলহ-বিচ্ছেদ, ষড়্‌রিপু নেই মনে করা একেবারেই ভুল। এঁদের মধ্যেও মন আছে যেমন মান-অভিমান করে, আবেগে ভেসে যায়, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। মনের এই বিচিত্র লীলার দিক থেকে ভাবলে কক-বরক ভাষী, বাঙালী, ইংরেজ, রাশিয়ান, আমেরিকান, ইহুদীতে কোন তফাৎ নেই। কক-বরক প্রবাদবাক্যগুলোকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করলে এ সত্যটি পরিষ্কার হয়।

সংস্কৃতে যেমন 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী,' তেমনি ককবরকে— 'সূর্যের মত তেজী এবং মায়ের মত ভাল, আর কিছু নেই'। বাংলা প্রবাদে যেমন বলা হয়েছে - বউ-এর সোহাগে মাকে লাঞ্ছনা দেওয়ার কথা তেমনি কক-বরকে স্ত্রৈণ পুরুষকে বিদ্রূপ করা হয়েছে— 'মাকে ছেড়ে বউকে প্রণাম'। সমতলবাসীদের মধ্যে যেমন 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' তেমনি বনবাসীদের মধ্যেও 'হাতী পালানোর পর মুগুর ছুঁড়ে মারা হয়'। ইংরেজীতে যেমন Too many cooks spoil the broth, তেমনি কক-বরকে 'অতি বেশী রাঁধুনী হলে পাট শাক সেদ্ধ হয় না।' বাংলায় যেমন রথ দেখা ও কলা বেচা একসাথে হয়, কক-বরকেও তেমনি 'নদী দেখা ও স্নান করা' একসাথেই হয়। অন্যান্য সমাজ-জীবনে যেমন চপলতা বড় দোষ, চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়, চাল যার পান তার, কক-বরক ভাষাভাষীদের মধ্যেও তেমনি লেজ বেটে ও লম্বা হাতকে কেউ পছন্দ করে না।

এইভাবে তুলনামূলক আলোচনা করলে মনে হয় সামাজিক জীবনে সকল ভাষার অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড মোটামুটি একই রকমের।

মজিলপুরের বাসগৃহে ( সুরেন্দ্র নিকেতন ) একটি দুষ্প্রাপ্য প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনাদির সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। তাঁর সংগ্রহ দেখবার জন্ম এবং তাঁর কাহিনী শোনবার জন্ম সেই সময় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ স্টেলা ক্রেমরিশ ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রায়ই যেতেন, তাঁর বাসগৃহে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হোত বড় বড় কন্‌ভেনশান, প্রখ্যাত পণ্ডিতদের সমাবেশে পূর্ণ হোত সে সভাস্থল। সে সব আলোক-চিত্র এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে তাঁর বাড়িতে। ধর্মমতে তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। জীবন-অপরাহ্নে বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চায় মগ্ন থাকতেন, কিছু লেখালেখি আরম্ভও করেছিলেন।

সুন্দরবন অঞ্চলে জৈন-সভ্যতার প্রচার-কাহিনী কালিদাস দত্তই প্রথম আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত জৈন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত পূরণচাঁদ নাহার তাঁর প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। অকালমৃত্যু তাঁকে গ্রাস না করলে আমরা আরও অনেক কিছু তাঁর কাছ থেকে পেতাম এবং মধ্য ২৪ পরগণা আজ অনাবিষ্কৃত থাকত না। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন অমায়িক, পরিপূর্ণ ভদ্রলোক। তাঁর দানশীলতার কথা মজিলপুরের পথে-প্রান্তরে আজও শোনা যায়। জমিদারতনয় হলেও 'জমিদার-সুলভ' আচরণ কখনও তাঁর চরিত্রে দেখা যায়নি। বহু শিক্ষার্থীকে, বিশেষ করে নবীন গবেষকদের প্রতি দরদ ছিল প্রচুর, বহু দরিদ্র শিক্ষার্থীকে অর্থসাহায্য দিয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে আজ অনেকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। *দুঃখ এই, এমন একজন বরেণ্য ব্যক্তির মর্মর মূর্তি কোথাও স্থাপিত হোল না, কোনো* রাস্তা বা পার্ক তাঁর নামে চিহ্নিত হোল না এবং তাঁর রচনাবলী সংগ্রহ কোরে কেউ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে এগিয়ে এলো না। তবে আশা এই, কোনো মনীষা কোনোদিন ব্যর্থ হয়নি, বোধহয় হবেও না।

## রচনাপঞ্জী

বন্ধু। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় 'মজিলপুর' থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি স্বয়ং কালিদাস দত্ত।

ছত্রভোগ। ( সচিত্র প্রবন্ধ ) ১৩৩০ সাল, শারদীয়া সংখ্যা।

খাড়ী। শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭১ সাল ( শেষ সংখ্যা )।

সোনারপুর আরাপাঁচ জল নিষ্কাশন পরিকল্পনার ( বারুইপুর থানার উত্তরভাগ গ্রামে ) উদ্বোধন বিবৃতি। ৭ই জুন, ১৯৫৩। ১ম পৃষ্ঠা

২৪ পরগণার ইতিহাস। ( হাত মেসিনে ছাপা কিছু পৃষ্ঠা, পুত্র শ্রীঅমল দত্তের কাছে আছে )।

শিবের গাজন ও চড়ক পার্বণ। ১ম বর্ষ, ৫ ও ২৬ সংখ্যা, ১৩৫৮, ১-৪ পৃষ্ঠা।

প্রবাসী। সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বহড়ু গ্রামের কয়েকটি পুরাতন ভিত্তিচিত্র। আশ্বিন-চৈত্র, ১৩৩৯ সাল।

প্রাচীন যুগে পশ্চিম সুন্দরবন। শ্রাবণ, ১৩৫১ সাল।

নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা। আষাঢ়, ১৩৫৮ সাল।

মজিলপুর ( সচিত্র )। আশ্বিন, ১৩৫৮ সাল।

আদিগঙ্গার মানচিত্র ( প্রবন্ধসহ )। বৈশাখ, ১৩৫৯ সাল।

পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত কয়েকটি শৈবমূর্তি। আষাঢ়, ১৩৫৯ সাল। পৃ. ৩২১-৬৩।

পৌরাণিক গ্রন্থে ভারতের আদিম মানব প্রসঙ্গে। ভাদ্র, ১৩৫৯ সাল। পৃ. ৫৭৯-৮১।

ছত্রভোগ ( সচিত্র )। মাঘ, ১৩৫৯ সাল।

শ্রীচৈতন্যদেবের পতিতোদ্ধার। মাঘ, ১৩৬০ সাল।

উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্যদেব। বৈশাখ, ১৩৬১ সাল।

প্রাচীন ভারতের লোকায়তিক বিপ্লব। কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ সাল।

নাম সংকীর্তন। ফাল্গুন, ১৩৬১ সাল। পৃ ৫২৯।

বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র (সচিত্র)। ভাদ্র, ১৩৬৩ সাল।

ভারতবর্ষ।

সরিষাদহ ও দক্ষিণ বারাসত। শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল।

সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস। আশ্বিন, ১৩৩৫ সাল।

[ মজিলপুরের ৩৫ জন পণ্ডিতের পরিচয় সহ। ]

জয়নগর-মজিলপুর। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল।

খাড়ি। আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল।

সংস্কৃতি। সম্পাদক : শ্রীসুধাংশুকুমার বসু। পোঃ—কামরাবাদ, থানা—সোনারপুর, ২৪ পরগণা।

রায়মঙ্গল কাব্যে রাজা মদন রায়। মহালয়া, ১৯ আশ্বিন, ১৩৭১ সাল।

ভাষণ : বাংলার লোক সংস্কৃতি। নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৭১ সাল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার অতীত ইতিহাস-সংকলন : কমভেনশানে প্রদত্ত ভাষণ।

চব্বিশ পরগণা। সম্পাদক : শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। ( সাপ্তাহিক ) দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সুন্দরবন অঞ্চলের আদিপর্বের ইতিহাস। ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৯।

ভারতীয় লোকযান। সম্পাদক : ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল।

(A Journal of Indian Folk Lore) ১৩৫, বিপিন পাল রোড। কলি-২৬।

বারাঠাকুর। ১ নং ভলুম ১৯৬৭।

বড়খাঁ গাজীর গান। VOL. VI/NO 1., 1963.

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত। ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭

বৈদিক ভারতের লোকায়তিক মতবাদ। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৪ সাল।

মৈত্রী। সম্পাদক : গোপীনাথ ভট্টাচার্য, জয়নগর, মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

Art of Some Unknown Aboriginal People of the Sundarban, শারদীয় সংকলন, ১৩৭৫ সাল।

সোমপ্রকাশ। সম্পাদক : বিষ্ণু চক্রবর্তী, রাজপুর, ২৪ পরগণা।

বৈদিক ভারতের লোকায়তিক দর্শন। শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৫ সাল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার অজ্ঞাত আদিম যুগ। (সম্পাদক, ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য) ৩য় বর্ষ। ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৬-৬৭ সাল।

ইতিহাস- সম্পাদক, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও অমলেশ ত্রিপাঠী। ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি। ৩৫/১, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শতাব্দী ২য় খণ্ড, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৪ সাল।

*Journal of the Indian Society of Orient Art*. Editors: Abanindranath Tagore & Stella Kramrisch.

A Candrasekhara Siva image. vol. IX, 1941.

সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সম্পাদক শ্রীসজীবকুমার বসু। চব্বিশ পরগণা, জেলা সংস্কৃতি পরিষদ। ১০, হেষ্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা-১।

রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ সাল। পৃ. ৫২০।

*Varendra Research Society.*

The Antiquities of Khari. Monographs No. 1. and Annual Report. Rajsahi, 1929 Monograph No. 3.

The Antiquities of the north-west Sundarban—Monograph No. 4.

The Antiquities of the Sundarbans—Ibid. No. 5.

সোনামাটি। বাংলার লোকশিল্প। শারদীয়া সংখ্যা।

বৃহৎ বঙ্গ ( গ্রন্থ )—দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। ২য় খণ্ড, ১৩৪২ সাল।

'সুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ, পৃ. ১১২৬—১১৩২।

*Science & Culture.*

Some Primitive Antiquities from the Sundarban. vol. 21, July, 1961.

*Modern Review.*

Some early Archaeological finds of the Sundarban. July, 1963.

*Indian Historical Quarterly.*

Two Soura image from the District of 24 Parganas. Calcutta, 1933.

গ্রামের দাবী।

জটার দেউল। শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৪ সাল।

প্রজ্ঞা।

জয়নগর। ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

পঞ্চপুষ্প।

সুন্দরবনে আবিষ্কৃত জৈনমূর্তি। আষাঢ়, ১৩৩৯ সাল।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

পৌণ্ড্রবর্ধন ও বর্ধমান ভুক্তি। ১ম সংখ্যা, ১৩৪১ সাল।

পঞ্চানন্দের গান ( সচিত্র )। ৬৪ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৪ সাল।

**কালিদাস দত্ত সম্পর্কে :**

কালিদাস দত্তের জীবনী। মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৭২ সাল।

শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্তের স্মরণে। মৈত্রী পত্রিকা, শারদীয়া সংকলন, ১৩৭৫ সাল

ঐ নাগরিক সম্বর্ধনা। ঐ

এম. এন. রায়ের সহিত কালিদাস দত্তের সাক্ষাৎকার। দেবিদাস ভট্টাচার্য—মৈত্রী পত্রিকা।

সুন্দরবনের আবিষ্কর্তা—তারাপদ সাঁতরা।

কালিদাস দত্ত : একটি ঐতিহাসিক নাম—ডঃ সুনীল ভট্টাচার্য। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৭৫-এর স্মারক পত্রিকা। পোঃ— সাউথ রামনগর ( বারুইপুর ) ২৪ পরগণা।

[ পূর্বোক্ত 'মৈত্রী' পত্রিকায় (শারদীয়া, ১৩৭৫). ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীমন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায়

( সাউথ গড়িয়া, ২৪ পরগণা ), রায় বাহাদুর জলধর সেন, অসীম মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বহু বরেণ্য ব্যক্তির চিঠি-পত্র ও নাগরিক সম্বর্ধনায় একখানি অভিনন্দন পত্র প্রকাশিত হয়। ]

**Archaeological Discovery : ( প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার )**

A list of objects of art antiquity besides books, Show cases, etc. belonging to the Private collections :—

(1) Canon—Period of East India Company.

(2) A 'Pata Chitra' framed with glass depicting am enthrowned royal figure.

(3) Divine musician. Wood Carving. ; Birbhum.

(4) Terracotta Plaque depicting a dancing figure.

(5) Wood Carving representing a Brahmin.

(6) Jadu pat—Bankura.

(7) An Apsara—Wood Carving.

(8) 'Pata Chitra'—Depicting a caval cade.

(9) A charioteer—Wood Carving.

(10) Dakshin Roy—Pottery Image.

তাঁর নিজস্ব সংগৃহীত বহু মূল্যবান্ পুরাবস্তুর বেশ কিছু অংশ তিনি দান করেছিলেন কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগ্রহ শালা, পঃ বঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব অধিকার, গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম, হুগলীর রাজবল হাটের অমূল্য প্রত্নশালা, হাওড়া জেলার বাগনানে 'আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা' প্রভৃতি সংগ্রহালয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে দান করেছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে, ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কিছু পণ্ডিতবর্গকে।

তাঁর দানসামগ্রী, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল এবং সেন যুগের অসংখ্য প্রস্তর-ভাস্কর্য, পুতুল, মৃন্ময় মূর্তি ( টেরাকোটা ), প্রস্তর যুগের অমূল্য তথ্যাদি, প্রায় ৬ শতের মত মহামূল্যবান্ দুর্লভ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি, সংগ্রহ শালা রক্ষার জন্য যাবতীয় আসবাব পত্রাদি, আজ পঃ বঙ্গ সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক অধিকারে সুসজ্জিত রয়েছে।

বহু খোঁজা খুঁজির পর বিস্তর আয়াসে ঐতিহাসিক কালিদাস দত্তের রচনাবলীর আংশিক সন্ধান করতে পেরেছি ; তবে বোধ করি, এ অংশ অধিকাংশই। এখনও কিছু মূল্যবান্ লেখা নানা প্রসিদ্ধ পত্রিকায় যে পড়ে রইল, তাতে সন্দেহ নেই। আশা রইল পরবর্তী কোনো অনুসন্ধিৎসুর প্রচেষ্টায় তা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। খুবই

দুঃখের সঙ্গে অনুভব করেছি, এমন একটি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয়, কেবল সাধারণই নয়, অনেক অ-সাধারণ পণ্ডিতেরও অগোচরে র'য়ে গেছে এবং তরুণ গবেষকরা যার সন্ধান পেলে বিশেষ উপকৃত হ'তে পারতেন ; কিন্তু পারেননি শুধু মাত্র একটি গ্রন্থের অভাবে। খুবই ইচ্ছা ছিল, নানা উপলক্ষে সে চেষ্টাও করেছি স্বর্গত দত্তের রচনা সংগ্রহ একত্রে প্রকাশ করতে ; কিন্তু বলতে বাধা নেই, অর্থাভাবের জন্যই তা সম্ভব হয়নি ; তাই এই গ্রন্থসূচী ( Bibliography ) প্রকাশের পর যদি কোনো সক্ষমের দ্বারা, কার্য সিদ্ধি হয়, তাহলে বিশেষ ক'রে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ইতিহাস-প্রণয়ন সহজ হয়ে বাংলার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করবে। আমার একাজের জন্য স্বর্গত দত্তের পুত্রদ্বয় ডঃ বিমল দত্ত ও শ্রীঅমল দত্ত, শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য ও পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ও তাঁর প্রিয় ছাত্র শ্রীতারাপদ সাঁতরা প্রমুখের নিকট ঋণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

পঁচাশীতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে

৮ই শ্রাবণ ১৩৮৪ ॥ ২৪শে জুলাই ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ

**শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল )**

প্রদত্ত

# সভাপতির অভিভাষণ

সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৫তম প্রতিষ্ঠা-দিবসে আপনাদের অভিবাদন করিয়া আমি শুধু এই নিবেদন করিতেছি যে এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বাঙালী-গৌরবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, আপনাদের শুভ ইচ্ছা এবং আন্তরিক সহযোগিতা ইহার উপর বর্ষিত হউক।

তাহার পর প্রণাম নিবেদন করিতেছি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। ছাত্রজীবন হইতে আমরণ তিনি পরিষদের সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বিগত চারি বৎসরের অধিক কাল সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি আজ নাই, কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি তাঁহার আশীর্বাদ আমাদের সতত রক্ষা করিবে।

রাজনীতি, ব্যবসায়, সমর-নৈপুণ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা—এসব কোনও ক্ষেত্রেই আজ বাঙালী অগ্রগণ্য নহেন। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালীর মহিমা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙালী-প্রতিভার এই মণিমাণিক্যগুলি রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সে প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে হয়তো সফল হয় নাই, তবু ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা বাঙালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালীর সাহিত্য, বাঙালীর শিল্প, বাঙালী প্রতিভাবান্ গুণীদের চিত্ররাজি সসম্মানে রক্ষা করিতেছে। এ পরিষদ্ আপনাদেরই কৃতী পূর্বপুরুষদের মহিমা-তীর্থ। আসুন, এই পরিষদ্‌কে আমরা প্রণাম করি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রথম-বাংলা গদ্য-লেখক রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সে পুস্তকের বাংলা আজ যদি পড়েন, অনেকেই বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন না। তাহার পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদীপ্ত প্রকাশ এবং তাঁহার পর পরই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-সমারোহ বঙ্গ সাহিত্যকে পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে যে আভিজাত্য দান করিয়াছে তাহার তুলনা অন্য কোনও সাহিত্যে নাই। আধুনিক

বাংলা সাহিত্যের বয়স প্রায় দেড়শত বৎসর এই স্বল্প সময়েই সে পৃথিবীর সাহিত্য-সভার গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে।

বহুকাল পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে সাহিত্য যতক্ষণ না ব্যবসায়ে পরিণত হইতেছে ততক্ষণ সাহিত্যের সম্যক্ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন দেখিতে পাইতেন ব্যবসায়ের কবলে পড়িয়া সাহিত্যের কি দুর্দশা হইয়াছে। যে দেশে অধিকাংশ লোকই সুশিক্ষিত সে দেশের পক্ষে তাঁহার উক্তি হয়তো সত্য, কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই মূর্খ, খুব কম লোকই সুসাহিত্যের আস্বাদন লইতে সক্ষম। তাই ব্যবসায়ীরা নিম্নমানের কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য ছাপাইতে ব্যস্ত। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজের মনকে উন্নত করা, সাহিত্যের আদর্শ সত্য-শিব-সুন্দরের রূপকে সৃষ্টির ব্যঞ্জনায় অপরূপ করিয়া পাঠক-পাঠিকাদের মনে নির্মল আনন্দ সঞ্চার করা—কিন্তু আমাদের সাহিত্য ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীদের কবলে পড়িয়া ক্রমশ আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের মনকে পশুত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা ক্ষোভের বিষয়। তবে আমি আশাবাদী, আমার মনে হয় শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের এ দুর্দিন কাটিয়া যাইবে। যাঁহারা প্রকৃত সাহিত্য-রসিক তাঁহাদেরও এ বিষয়ে একটা দায়িত্ব আছে বলিয়া আমি মনে করি। প্রকৃত সাহিত্যিককে উৎসাহিত করিতে হইলে তাঁহাদের বই কিনিতে হইবে। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া বই কেনা সব সময়ে সুসাধ্য নহে। আমি তাহা জানি; তবু আমি তাঁহাদের অনুরোধ করিব মাঝে মাঝে, বৎসরে অন্তত একবারও কোনও সৎগ্রন্থ কিনিয়া প্রকৃত সাহিত্যসেবকদের আপনারা উৎসাহিত করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গত বৎসর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল কাজ করিয়াছেন এবং পরিষদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্ত প্রয়াস পাইতেছেন তাহার পরিচয় পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের বার্ষিক প্রতিবেদন হইতে আপনারা পাইবেন। আর্থিক অসচ্ছলতা ও নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও পরিষদের অগ্রগতি লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও জনসাধারণের সহায়তায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ উত্তরোত্তর শ্রীমণ্ডিত হইবে ইহাই আমাদের আশা। সাহিত্যিক ডক্টর শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁহার সহৃদয় সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইবে না, আশা করি।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্য ইত্যাদি বহু দুষ্প্রাপ্য উপকরণ বিভিন্ন স্থান হইতে পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরিষদের শরৎ-প্রদর্শনীটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সেই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন কুমার

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে পুস্তকটি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নানাবিধ তথ্যেসমৃদ্ধ এবং নানা চিত্রে সুশোভিত। এরূপ আর দ্বিতীয় কোনও পুস্তক আমার চোখে পড়ে নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে শ্রীনিরঞ্জন সরকার রচিত 'জগদানন্দ রায়' পুস্তকখানি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকটি যদিও ছোট কিন্তু জগদানন্দ রায় সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ঐ পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

আর একটি অমূল্য পুস্তক 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বর্তমান বর্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। এই 'প্রস্তাব'টি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে প্রথম পাঠ করিয়াছিলেন এবং পাঠের পর উহা মাত্র দুই শত কপি মুদ্রণ করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন—এ পর্যন্ত ঐ সংস্করণের পুস্তক বহু গবেষকের অজ্ঞাত ছিল। পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বহু অনুসন্ধানে সংগ্রহ করিয়া ও বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় তাঁহার সংশোধিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের পাঠান্তরসহ সম্পাদনা করিয়াছেন। পরিষৎ প্রকাশিত এই বইটির আরও আকর্ষণ যে, ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ইহাই তাঁহার রচিত সর্বশেষ গ্রন্থভূমিকা।

পরিশেষে এই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি যে আপনারা সকলে যদি ঐকান্তিক-ভাবে ইচ্ছা করেন আমাদের সমস্ত অভাবই দূর হইবে। এই ঐকান্তিক ইচ্ছার উৎস, আগ্রহ ও ভক্তি।

নমস্কার।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির
৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৪
২৪শে জুলাই, ১৯৭৭

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
( বনফুল )

# পরিষৎ-সংবাদ

গত ৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, ২৪শে জুলাই, ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঁচাশীতম প্রতিষ্ঠা দিবসে চুরাশীতম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সাধারণ সদস্যগণ প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের নানা কার্যে বিক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দৃঢ় অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে সভায় সভাপতির নির্দেশে সেই সভা স্থগিত ছিল। অনেক টালবাহানার পর উক্ত স্থগিত সভা গত ১লা আশ্বিন, ১৩৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় প্রাক্তন সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত চুরাশীতম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ অগ্রাহ্য হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাবও অননুমোদিত হয়। বিগত কার্যনির্বাহক সমিতির প্রস্তাবিত ১৭ জন কর্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে সভাপতি, চারিজন সহকারী সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং পুথিশালাধ্যক্ষের নাম সেই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে গৃহীত ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচনকে অবৈধ সুতরাং অসিদ্ধ বলিয়া সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাহা পরিত্যক্ত হয় তবে তিনজন বিশিষ্ট সদস্যের নাম অনুমোদিত হইয়াছিল। তাঁহারা হইতেছেন :

(১) ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, (২) ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন এবং (৩) ডঃ ফণিভূষণ চক্রবর্তী।

১লা আশ্বিন ১৩৮৪ সাধারণ সভায় নির্বাচিত সদস্যসপ্তক ৯ই আশ্বিন ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে কার্যকরী সমিতির ১০টি শূন্যপদ পূরণ করেন। কার্যনির্বাহক সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন শাখাসমিতি ও উপসমিতিসমূহ যথাযথভাবে গঠিত হয়। বিগত কয়েক বৎসরের নানা দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একটি 'দুর্নীতি তদন্ত সমিতি' গঠিত হইয়াছে এবং পরিষৎ নিয়মাবলীকে পরিষদের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য একটি 'নিয়মাবলী সংশোধন সমিতি' গঠিত হইয়াছে এবং ঐ সিদ্ধান্ত মাসিক অধিবেশনে অনুমোদিত করাইয়া লওয়া হইয়াছে।

চুরাশীতম বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির কুড়িজন সদস্যের জন্য পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ বৈধ, অবাধ ও গণতান্ত্রিক। ভোটদানের শেষ তারিখেই সর্বসমক্ষে ভোট গণনা কার্য সম্পূর্ণ করা হইয়াছে এবং পরবর্তী কার্যনির্বাহক সমিতি ও বিশেষ সাধারণসভায় তাহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইয়াছে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় ৮৩ বর্ষের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। পরিষৎ-কর্মচারী-গণের বেতনবৃদ্ধির জন্য একটি বেতনকাঠামো গঠন করিয়া তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

পরিষদের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রবাহ নূতন করিয়া অব্যাহত রাখিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। নিয়মিত উপসমিতিগুলির, কার্যনির্বাহক সমিতি এবং মাসিক অধিবেশন সমূহ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই পর্যন্ত কার্যনির্বাহক সমিতির মোট আটটি অধিবেশন ও পাঁচটি মাসিক অধিবেশন ও বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচিত সদস্যগণসহ পরিপূর্ণ কার্যনির্বাহক সমিতিতে এই বৎসরের সমস্ত কার্য অনুমোদিত করাইয়া লওয়া হয় এবং দুইজন হিসাবপরীক্ষক নিযুক্ত হন। বর্তমান বর্ষের সম্পূর্ণ কার্যনির্বাহক সমিতিও ঐ সভায় অনুমোদিত হয়।

মাসিক অধিবেশনসমূহে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা ও জন্মশতবর্ষ পালন, কবি গুরু দত্তের মৃত্যুশতবর্ষ পালন, সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সভা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া চলিলেও পরিষদের স্বাভাবিক কার্য বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। সরকারী অনুদানসমূহ পাওয়া গিয়াছে। চিত্রশালা ও পুঁথিশালা সংস্কার ও পরীরনের কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। পরিষৎগৃহের ছাদ মেরামত করা হইয়াছে। চিত্রশালা ও পুঁথিশালার উন্নততর বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা হইতেছে। চিত্রশালার উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানানো হইয়াছে। দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রতিটি শাখাসমিতি ও উপসমিতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিভিন্ন শাখা-পরিষৎসমূহের বার্ষিক কার্যবিবরণী সংক্ষিপ্ত আকারে পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন শাখা পরিষৎকে পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ৩০% (শতকরা তিরিশ ভাগ) কমিশন দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রায় আটশত সদস্যকে বকেয়া চাঁদা মিটাইয়া দিবার জন্য যথানিয়মে অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। নূতন সদস্যপদ গ্রহণের ধারা পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

## বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতি

### ৮৫-তম বর্ষ

সভাপতি—ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

সহ সভাপতি—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
সম্পাদক : শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক
সহকারী সম্পাদক : শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী
শ্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য
কোষাধ্যক্ষ—ডঃ কানাইচন্দ্র পাল
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়
পত্রিকাধ্যক্ষ—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পুঁথিশালাধ্যক্ষ—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী
চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীদেবকুমার বসু

সদস্যবৃন্দ :

শ্রীরামশঙ্কর সিংহ, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলকেশ দে সরকার, ডঃ অশোককুমার কুণ্ডু, শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীকার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল, শ্রীনিখিলরঞ্জন রাহা, শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শ্রীকল্যাণী দত্ত, ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী, শ্রীসনৎকুমার মিত্র, ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরাজ বসু, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

শাখা-পরিষৎ প্রতিনিধি :
নৈহাটী শাখা—শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন
নবদ্বীপ শাখা—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য
মেদিনীপুর শাখা—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী
কৃষ্ণনগর শাখা—শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়
সম্প্রতি পুনর্গঠিত বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অছিরক্ষক সমিতি :
ডঃ সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
শ্রীঅশোককুমার সরকার
ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়
ডঃ কানাইচন্দ্র পাল ( কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে )

॥ সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত ॥

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

*সংবাদপত্রে সেকালের কথা*

১ম খণ্ড : টা. ১৫·০০

২য় খণ্ড : টা. ২৫·০০

*বাংলা সাময়িক-পত্র*

১ম খণ্ড : টা ৮·০০

২য় খণ্ড : টা. ৭·৫০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ : টা. ১২·০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : টা. ৫·০০

**বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ**

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

চতুরশীতিতম বর্ষ ।। তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

কার্তিক-চৈত্র

১৩৮৪

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

# সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৪তম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা
কার্তিক-চৈত্র
১৩৮৪

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৮৪তম বর্ষ ॥ সংখ্যা : ৩য়-৪র্থ
কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৩৮৪

## সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৮৪ ॥ সংখ্যা ৩-৪
কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৪

# আচার্য সুনীতিকুমার স্মরণে

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত

১৯৭৭, ২৯শে মে; অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমাদের দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে একজন 'শালপ্রাংশু' ব্যক্তির তিরোধান ঘটল। তিনি পরিণত বয়সে পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে বিদায় নিয়েছেন। তথাপি তাঁর মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হয়েছে, তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। সে-কথা আরও সত্য এই কারণে যে বার্ধক্যেও তাঁর কর্মশক্তি কমেনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্য আকাদেমীর পুরোধা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং অনুরূপভাবে আরও এই জাতীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি কেবল একজন অগ্রগণ্য ভাষাতাত্ত্বিক এবং প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ছিলেন না। শুধু ভাষা জেনেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি, গভীরভাবে তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান ক'রেছেন। আমি আজও সবিস্ময়ে স্মরণ করি, মৃত্যুর এক বৎসরেরও কম আগে, একদিন আমাকে মারাঠী ও কোঙ্কণী ভাষার সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে কি রকম উৎসাহিত—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। কোঙ্কণী মারাঠীর একটি উপভাষামাত্র নয়। স্বাধিকারে সে একটি স্বতন্ত্র ভাষা। তাঁর এই অভিমত একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। আপন অভিমতের সত্যতায় তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল, তাই তাঁর সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা থেকে বিরত থাকেননি।

এই সত্যসন্ধানী অক্লান্ত কর্মবীরকে হারিয়েছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রিয় সঙ্গী বইগুলি তাঁকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাচর্চার মধ্যেও যে সকল সারস্বত প্রতিষ্ঠানকে তিনি ভালোবাসতেন, তার তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও কাজ করবার জন্যে সময় করে নিতেন। তাঁর বিয়োগে আমরা শোক করব, কিন্তু এই ভেবে আনন্দও পাব যে, যে-কাজ তিনি ভালোবাসতেন, তাই সাধন করতে করতেই তিনি মারা গেছেন, সাধারণের বেশী আয়ু পেয়েও তিনি সক্রিয় অবস্থাতেই গিয়েছেন। আমরা, যারা তাঁকে জানবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, নিশ্চয় অন্য অবস্থা চাইনি। জ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতিসাধনই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, আর সেই জীবনই তিনি উপভোগ করে গেছেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বার্ধক্য ও জরার জন্যে যদি তিনি এতে অপারগ হতেন, তবে জীবনই হ'ত তাঁর মৃত্যুর সমান।

আমরা যারা পড়ে রইলাম তাঁর প্রিয় কর্মের দায়িত্ব বহনের জন্ম, আমরা কি করব? অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মত পণ্ডিত প্রতিদিন জন্মায় না। তাঁর মত আর একজনকে হয়তো দু'এক পুরুষের মধ্যেও পাব না। যে সব প্রতিষ্ঠানকে তিনি ভালোবাসতেন, সেখানে জ্ঞানীদের সমাদর, সে-সবের উন্নতিসাধনের ভার আমাদেরই উপর। আমরা কি শুধু তাঁর স্তুতিগান গাইব আর পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ তুলব, না তাঁর অসমাপ্ত কর্মভার বহন করে চলব?

আমি অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁর জীবন-সন্ধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাজে তিনি যেভাবে আত্মনিয়োগ করতেন, তা দেখে আমি অবাক্ হতাম। প্রথম যখন পরিষদের আর্থিক প্রয়োজন পরীক্ষা এবং সাহায্য অনুমোদনের জন্ম ভারত সরকারের কাছ থেকে দায়িত্বভার নিয়ে কলকাতায় আসি, তখন অধ্যাপক-প্রবর ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্ম নিজেই আমার বাসগৃহে আসবার প্রস্তাব করেন। আমি তাতে লজ্জা পেয়েছিলাম। তিনি প্রবীণ, আমি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তবু তাঁর প্রিয় পরিষদের কল্যাণে এ প্রস্তাব করতে একটুও দ্বিধা বোধ করেননি। আমি অবশ্য তাঁকে ঐ কষ্ট স্বীকার করতে দিতে পারিনি। কয়েকবারই আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। প্রত্যেকবারই তিনি আমাকে সময় দিয়েছেন। দেখেছি, কি গভীর এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ!

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে তাঁর স্বপ্ন অনুযায়ী পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করায় চেয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্টতর কোনও উপায় আমি জানি না। কয়েক পুরুষ ধরে পরিষৎ বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সাধনার সঙ্গে যুক্ত। তিনিও আজ অতীতের সাধকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহান্ পূর্বসূরীদের আদর্শ অনুসরণে তিনি পরিষদকে বঙ্গীয় সাহিত্য প্রতিভার বিকাশকেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। পরিষদের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবার এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম তিনি আর্থিক ও সাংগঠনিক সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। সে সংগ্রাম যেন ব্যর্থ না হয়। জাতিকেই দেখতে হবে যেন ব্যর্থতা না আসে। যে মহান্ পুরুষকে আমরা হারিয়েছি, তাঁর উদ্দেশে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য কি জাতি নিবেদন করবে না? *

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রণের উদ্দেশ্যে মূল ইংরেজী পাণ্ডুলিপির বঙ্গানুবাদ শ্রীযুক্ত দত্তের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রকাশিত। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

# সুনীতিকুমার স্মরণে

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

আমি স্বর্গীয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম না। আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁহার সহপাঠী স্বর্গীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রমধ্যে গণনা করিতেন। সেই সূত্রে আমি সুনীতিকুমারকে বরাবর শিক্ষকের সম্মান দিয়াছি এবং তিনিও আমাকে চিরদিন বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বিরাট্ বটবৃক্ষের ন্যায় তিনি নানাভাবে আমাদের আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। তাই আজ অকস্মাৎ তাঁহার তিরোধানে নিজেকে অসহায় বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার বিয়োগের বেদনা আমার পক্ষে অনেকটা পিতৃশোকের তুল্য।

প্রথম হইতেই যাহা আমাকে সুনীতিকুমারের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল সে তাঁহার ভাস্বর প্রতিভা। তাঁহার অদ্ভুত স্মরণশক্তি, বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের গভীরতা, সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপকতা, নানা দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রকাশের মনোরম ভঙ্গী, সহজে সাবলীল ভাবে ভাব-প্রকাশের দক্ষতা এবং অপরিসীম ভদ্রতাবোধ আমাকে অবাক্ করিত। তাঁহার চরিত্রে আর যে একটি বস্তু আমি শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি সেটি তাঁহার বিরাট্ ব্যক্তিত্বের উপর বাঙালীত্বের সুস্পষ্ট ছাপ। একবার কি কারণে যেন বাংলার বাহিরে কোন একটি স্থানে অন্যের দেখাদেখি আমি মস্তক আবৃত করিতে যাইতেছিলাম। সুনীতিকুমার নিকটে ছিলেন। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "আমরা বাঙালী, নাঙ্গা মাথাই আমাদের পরিচয়।"

পৃথিবীর উল্লেখনীয় ভাষার মধ্যে এমন কোনটি ছিল না যার ৫/১০ পংক্তি সুনীতিকুমার মুখস্থ বলিতে পারিতেন না। তাঁহাকে আমাদের মত ভাবিয়া-চিন্তিয়া লিখিতে হইত না। একবার তিনি আমার সম্মুখেই আমাকে দুই পাতার একটি প্রশংসাপত্র লিখিয়া দেন। আমি অবাক্ হইয়া দেখিলাম যে, পত্রটি লিখিতে গিয়া তাঁহাকে ভাবিতে বা কলম তুলিতে হইল না। যেন সমস্তটাই তাঁহার মস্তিষ্ক মধ্যে লিখিত ছিল। আমি এই ভাবে তাঁহাকে অনর্গল বলিয়া যাইতেও শুনিয়াছি। তাহাতে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। আর এমন সরসভাবে তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিতেন যে, শ্রোতারা আনন্দ পাইত।

আমি প্রথম সুনীতিকুমারের সংস্পর্শে আসি সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের ত্রিবান্দ্রম এবং তিরুপতি অধিবেশনের সুযোগে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন ত্রিবান্দ্রম সম্মেলনে যাই তখন আমি সবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারাররূপে প্রবেশ করিয়াছি। সে সময় শীতকাল মাদ্রাজ-দক্ষিণ মারাঠা রেলওয়েজ এবং দক্ষিণ ভারতীয়

রেলওয়েজ যুক্তভাবে সীজন টিকেট বাহির করিত। উহাতে ৪৫দিন পর্যন্ত ওয়ালটেয়ার ও পুণা হইতে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করা চলিত। আমি ২২ টাকা দিয়া এইরূপ একটি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনিয়াছিলাম। অনেকেই ৩৫ টাকা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সীজন টিকেট কিনিলেন। তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে এখনকার প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা সুবিধা বেশী ছিল। ফেরার পথে আমি অবাক্ হইয়া দেখিলাম, ত্রিবান্দ্রম-মাদ্রাজ এক্সপ্রেসে বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক সুনীতিকুমার তৃতীয় শ্রেণীতে আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। কথায় কথায় আমি তাঁহার এই গরিবি চালে ভ্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে, উচ্চ শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া যত বেশী অর্থ নষ্ট হয়, সেই ব্যয়ে অনেকগুলি স্থান দেখিতে পাওয়া তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আরও বলিলেন, "যদি পৃথিবী দেখতে চান, বড়লোকি করলে চলবে না, লোটা কম্বল সম্বল করে বের হতে হবে।" সেই প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম, তিনি একবার কিরূপে একটিমাত্র সুট লইয়া সারা ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের চিত্তুর জেলার অন্তর্গত তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সুনীতিকুমার প্রভৃতি অনেকের মত আমিও ঐ অধিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেখানকার সুবিখ্যাত বালাজি মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্মিত ঘরগুলির এক একটিতে আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সন্নিহিত ভোজনশালায় দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। ভোজনশালায় কখনও কখনও আমি সুনীতিকুমারের ঠিক পাশের আসন গ্রহণ করিতাম। একদিন তিনি নানা বিষয়ের আলোচনা চালাইয়া যাইতেছিলেন এবং এটা ওটা মুখে দিয়া খাদ্যগুলির বিশেষ প্রশংসা করিতেছিলেন। তখন আমি দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্যে অনভ্যস্ত ছিলাম, সেগুলি আমার বিস্বাদ লাগিতেছিল। পরে আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, এই ভাল লাগার অনেকখানিই খাদ্যে ছিল না, ছিল সুনীতিকুমারের মনে। তাঁহার মনে সব কিছুর মধ্যে ভাল দিকটা দেখিয়া খুশী হইবার একটা প্রবণতা ছিল। অবশ্য পরবর্তী জীবনে দীর্ঘকাল দক্ষিণ ভারতে বাস করিয়া খাদ্য বিষয়ে আমি অনেকটা দক্ষিণ ভারতীয় হইয়া যাই। আবার সন্তোষের সাধনাতেও অনেক ক্ষেত্রে ফল লাভ করি। তার জন্য আমি সুনীতিকুমারের কাছে আমার ঋণ অনুভব করি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় মনে পড়িতেছে। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর ও মধুখালির মধ্যবর্তী গাজনাগ্রামের স্বর্গীয় ডাক্তার রামলাল সরকার কার্যোপলক্ষে বহুদিন ব্রহ্মদেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত একখানি ছাপানো উপন্যাসের নায়ক কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর মুখে বলানো হইয়াছে, কিরূপে তিনি শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে ব্রহ্মরাজের সেনাদলে যোগ দিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়িয়া ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এক মণিপুরী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৩৪৪ সালের 'প্রবাসী'তে গাজনার নিকটবর্তী নলিয়া গ্রামবাসী এক ব্যক্তি একটি প্রবন্ধে বলেন যে, তিনি মান্দালয়ে একখানি বাংলা আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন

এবং উহার লেখক রামলাল সরকার বা কুড়নচন্দ্র চক্রবর্তী শেষ ব্রহ্মযুদ্ধের একজন বীর বাঙালী সৈনিক। আমার পৈত্রিক বাড়িও গাজনার নিকটে শালকাঠী কৃষ্ণনগর গ্রামে এবং রামলাল বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাই আমি প্রবন্ধটির প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে, রামলালবাবুর গ্রন্থখানি ছাপানো হইয়াছিল এবং গ্রন্থকার উহাকে 'উপন্যাস' বলিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বঙ্গললনা, মণিপুরী মহিলা নহেন। আমি আরও লিখিলাম যে, 'আমার জীবনের লক্ষ্য' সংজ্ঞক ঐ গ্রন্থের একখণ্ড আমার কাছে আছে। তখন 'প্রবাসী' সম্পাদকের কাছে কিছু প্রশ্রয় পাইয়া প্রবন্ধ লেখক প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, দীনেশবাবু বর্মায় যান নাই, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর কথার কোনই দাম নাই, কারণ সুনীতি-কুমার প্রভৃতি যাঁহারাই বর্মায় গিয়াছেন, তাঁহারাই রামলাল সরকারের কীর্তিকলাপের বিষয় শুনিয়াছেন। অর্থাৎ রামলাল সরকার শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, সুনীতিকুমার প্রভৃতি তাহার সাক্ষী। কিন্তু আমার প্রতিবাদ পড়িয়া সুনীতিকুমার আমার কাছে বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে ছাপানো গ্রন্থটি পড়িতে দিলাম এবং রামলাল সরকারের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে দেখাইলাম যে, তিনি শেষ ব্রহ্মযুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে পদার্পণ করেন। সুনীতিকুমার তখন 'প্রবাসী'র জন্য আমাকে দিয়া কিছু লিখাইলেন এবং নিজেও কিছু লিখিলেন। তাঁহার রচনাটুকুতে যেন সেই আজগুবি প্রবন্ধটির লেখকের প্রতি কিছু দাক্ষিণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধের পরিচায়ক হইতে পারে। 'আমার জীবনের লক্ষ্য' বইখানি সুনীতিকুমারের খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি প্রায়ই আমাকে উহার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে বলিতেন এবং আমিও তাঁহাকে প্রকাশকের ব্যবস্থা করিতে বলিতাম। দুঃখের বিষয়, তিনি সে ব্যবস্থা করিয়া যাওয়ার সুযোগ পান নাই।

সুনীতিকুমারের Origin and Development of the Bengali Language (Vol. I-II, 1926) সংজ্ঞক মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিশ্বব্যাপিনী হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে উহা বাজারে অপ্রাপ্য হওয়ায় পণ্ডিত-সমাজে উহার নূতন সংস্করণের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে আমি যখন মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে বইখানি পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে না বলিয়া অনুযোগ করিতাম, তখন একদিন সুনীতিকুমার আমাকে বলিলেন যে, ঐ বই আগাগোড়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে এবং তাহা এত বেশী পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ যে তিনি সে কাজে হাত দিতে সাহস পাইতেছেন না। আমি বলিলাম, 'স্যার, ওটা এমন একটা বড় কাজ বলেই আপনার টেক্‌স্ট বই লেখা, স্কুল কলেজের পুরস্কার বিতরণ, ভবনাদির দ্বারোদ্ঘাটন প্রভৃতি অসংখ্য বাজে কাজ ফেলে ওতে হাত দেওয়া উচিত। কারণ ও কাজ আর কাউকে দিয়ে হবে না।' সুনীতিকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আরে ঐ সব বাজে কাজেও যে আমি আনন্দ পাই।" আমার পক্ষে এ-কথার জবাব ছিল না। যাহা হউক, মৃত্যুর পূর্বে একখণ্ড পরিশিষ্টের সহযোগে

গ্রন্থখানি যে তিনি পুনর্মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাও আমাদের কাছে অনেকখানি।

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোধগয়ায় মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধসভা অনুষ্ঠিত হয়। উহার উদ্বোধনের জন্য সুনীতিকুমার আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমি ছিলাম উহার বৌদ্ধ সাহিত্য-শাখার সভাপতি। তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালা গয়া শহরে অবস্থিত ছিল। প্রতিদিন সকালবেলা আমাদিগকে সেখান হইতে জীপে করিয়া বোধগয়ায় সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হইত। প্রাতরাশের পর আমরা কয়েকজন সুনীতিকুমারের কামরায় উপস্থিত হইতাম। তখন হইতে তাঁহার যে অনর্গল গল্পালোচনা আরম্ভ হইত, সভাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তাহার বিরতি ঘটিত না। সেই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার এইরূপ অফুরন্ত প্রাণশক্তি দেখিয়া আমি অবাক্ হইতাম।

সুনীতিকুমার আমার 'Select Inscription' (Vol I) ও 'Indian Epigraphical Glossary' সংজ্ঞক গ্রন্থ দুইটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং আমার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে নানা ক্ষেত্রে এমন প্রশংসার কথা বলিতেন যে আমি লজ্জিত হইতাম। এমন কি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনের গোড়ার দিকে আমি যখন কয়েক বৎসরের জন্য হিন্দুস্থান পার্কে অর্থাৎ সুনীতিকুমারের পাড়ায় বাস করিতে যাই তখন তিনি আমার বাড়িওয়ালাকে আমার যে পরিচয় দেন, তাহাতে আমি অভিভূত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "দীনেশবাবু মাইনে কমই পান, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে তিনি আমাদের কারও চেয়ে কম নন।" আমার সম্বন্ধে এমন কথা কেবল সুনীতিকুমারই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Visiting Professor হিসাবে আমি যখন আমেরিকায় যাই, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের 'ছাত্রগণের বিদায় সংবর্ধনা-সভায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সুনীতিকুমারের যোগদান আমার প্রতি তাঁহাদের স্নেহের পরিচয় দিয়াছিল।

ইদানীং সুনীতিকুমারের সহিত রামায়ণের সমস্যা লইয়া আমাদের যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেও আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ এবং আমার মতামতের উপর তাঁহার আস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৯৭৫ সালের শেষ দিকে দিল্লীতে ভারতীয় সাহিত্য আকাদমি কর্তৃক রামায়ণ সম্বন্ধীয় একটি আন্তর্জাতিক বিতর্ক-সভা আহূত হইয়াছিল। আকাদমির সভাপতিরূপে সুনীতিকুমার ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং সেখানে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিতর্ক-সভাটির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এশিয়ার যে সকল দেশে প্রাচীনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং রামায়ণ-কাহিনীর প্রবেশ ঘটিয়াছিল, উহাতে ভারতীয় পণ্ডিতগণের সহিত সেই সব দেশের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভাতে আমাকে প্রাকৃত এবং সংস্কৃত লেখ সাহিত্যে রামায়ণের উল্লেখ ও প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

দিল্লীর বিতর্ক-সভার সূত্রে সুনীতিকুমার যে রামায়ণের সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পরেও উহার জের চলিল। ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটীতে রামায়ণ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন এবং মাঝে মাঝে এ বিষয়ে তাঁহার মতামত সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন ব্যক্তির সমালোচনার কোন কোন মন্তব্যের জবাব দিতে থাকেন। তারপর সাহিত্য আকাদমির কলিকাতা শাখার উদ্যোগে জাতীয় পাঠাগারে এক আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হইল। সেখানে সুনীতিকুমারের সঙ্গে আলোচনার জন্য আরও দুই একজনের সহিত আমাকেও আহ্বান করা হইয়াছিল। এইভাবে সুনীতিকুমারের রামায়ণ-চিন্তার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। এ বিষয়ে সংবাদ পত্রে চিঠি লেখা ব্যতীত আমি ইংরাজী বাংলায় পাঁচটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে চারটি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার একটি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্-পত্রিকায় ছাপা হয়। ঐ পরিষদের সভাপতি ছিলেন সুনীতিকুমার। একথা বলার কারণ এই যে, সুনীতিকুমারের রামায়ণ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে আমি মাত্র একটির সমর্থক এবং অন্যগুলির বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু তৎসত্ত্বে তিনি কোনদিন কোনভাবে মনক্ষুণ্ণতা প্রদর্শন করেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার কথা তিনি জানিতেন। আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহার প্রতিষ্ঠাই যে আমার উদ্দেশ্য সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। সুনীতিকুমার আমার মতামতের কোন জবাব দেন নাই। বোধ হয়, পরে কোন গ্রন্থ-মধ্যে জবাব দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

রামায়ণ সম্বন্ধে সুনীতিকুমার যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিকে প্রধান বলা যায়। প্রথমতঃ, তাঁহার মতে রামচরিত্র এবং রামায়ণ-কাহিনী কাল্পনিক। দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করিতেন যে, বাল্মীকির রাম-কথা অপেক্ষা পালি ভাষায় রচিত 'দশরথ জাতকে'র কাহিনী প্রাচীনতর কালের সাক্ষী। তৃতীয়তঃ, তিনি বাল্মীকির রামায়ণের উপর প্রাচীন গ্রীক কবি হোমারের কাব্যের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন।

সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রথমটির সম্পর্কে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতই এ পর্যন্ত রামকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া মানিয়া লেন নাই। এ বিষয়ে আমি যে দু-একটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। রামায়ণের বাল্মীকি রচিত অংশকে অর্থাৎ অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত অংশটিকে পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর রচনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণ-কাহিনীর পরিবেশ এতদপেক্ষা অনেক প্রাচীন। এই কাহিনীতে যমুনার দক্ষিণ কূল হইতে ভারতের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বিজন অরণ্যের মধ্যে কেবলমাত্র কিষ্কিন্ধ্যার বানর রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ মৌর্যযুগে দক্ষিণ ভারতে বিদর্ভ, অশ্মক, চোল, পাণ্ড্য জনপদের এবং মাহিষ্মতী, প্রতিষ্ঠান, মথুরা ( দক্ষিণ মথুরা ) প্রভৃতি নগরীর অস্তিত্বের প্রমাণ

আছে। সুতরাং রাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে তিনি বাল্মীকির আমলে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বহুকাল পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাম যদি বাল্মীকির সমসাময়িক না হন, তবে বাল্মীকি রচিত জনৈক সুপ্রাচীন আদর্শ চরিত্র নরপতির কাহিনীতে কল্পনার প্রভাব না থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আবার রেলগাড়ি প্রচলনের পূর্ববর্তী আমলে, এমন কি খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দূরবর্তী তীর্থ স্থানের যাত্রীদের দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, রামায়ণ-বর্ণিত প্রাগৈতিহাসিক ভ্রমণ-ব্যবস্থায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার পক্ষে অযোধ্যা হইতে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত গিয়া আবার অযোধ্যায় ফিরিয়া আসা নিতান্তই অবাস্তব কল্পনা। প্রাচীন কালেই যাঁহারা রামায়ণ-কাহিনীতে নানা প্রক্ষেপের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেটা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাঁহারা সীতাকে জনস্থান হইতে শ্রীলঙ্কায় লইয়া যাওয়া এবং রাম প্রভৃতির শ্রীলঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসার ব্যাপারে অলৌকিক পুষ্পক নামক বিমানের কল্পনা করিয়াছেন। এই বিমান বস্তুটি আধুনিক এবং বিংশ শতাব্দীর পূর্বে অবশ্যই কাল্পনিক।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির সম্পর্কে আমি বলিয়াছিলাম যে, বহুদিন পূর্বে জার্মান পণ্ডিত বেবর তাঁহার 'Ulber des Ramayana' সংজ্ঞক রচনায় একথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে পণ্ডিতগণ মতটিকে অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জাতকের গাথা অর্থাৎ শ্লোক-অংশই কেবল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীর 'খুদ্দকনিকায়ের' অন্তর্গত। কিন্তু জাতকের গল্পাংশ পরবর্তীকালের রচনা। গল্পগুলির অধিকাংশ শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধভিক্ষুরা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি, জয়াদ্দিসজাতক এবং অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' (খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী) প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনীর উল্লেখ আছে, কিন্তু 'দশরথ জাতক'-কাহিনী সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন পরিচয় নাই। তাছাড়া, জাতকটির গল্পাংশ যে গাথাংশের বহু পরবর্তী, তাহার প্রমাণ আছে। গল্পের লেখক বিদেশীয় (সিংহলীয়) বলিয়া একটি গাথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, আবার তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের পরবর্তীকালীন প্রক্ষিপ্ত অংশের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। আর একটি কথা এই যে, বৌদ্ধ ও জৈন লেখকেরা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের কাহিনীগুলিকে বিকৃত করিয়া আনন্দ পাইতেন, তার বহু প্রমাণ আছে। বাল্মীকি শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদিগকে রাক্ষস বলিয়াছেন, তাই শ্রীলঙ্কাবাসী বৌদ্ধভিক্ষুরা তাঁহার রাম-কাহিনীর বিকৃতরূপ প্রচারে আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে, এটিও বেবরের মত। কিন্তু য়াকোবি নামক অপর একজন জার্মান পণ্ডিত তাঁর 'Das Ramayana' সংজ্ঞক গ্রন্থে সিদ্ধান্তটির অসারতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন এবং তখন হইতে পণ্ডিতেরা সকলেই য়াকোবির সমর্থক। সুতরাং সিদ্ধান্তটি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে য়াকোবির যুক্তিসমূহ খণ্ডন করা অত্যাবশ্যক।

আমি আরও বলিয়াছিলাম যে, বাল্মীকির গ্রন্থ পূর্বভারতে রচিত, কিন্তু এ অঞ্চলের সহিত গ্রীকদের সম্পর্ক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্তী।

সুনীতিকুমার এই সকল সমালোচনার কি জবাব দিতেন, হঠাৎ তাহার মৃত্যু ঘটায় তাহা জানা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। রামায়ণের সমস্যা লইয়া তাঁহার একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা বোধ হয় তিনি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

# মঙ্গলকাব্যের অনালোচিত অধ্যায় :
# নবাবিষ্কৃত কবি ও কাব্য

শ্রীত্রিপুরা বসু

১৮শ শতকের প্রথমার্ধ থেকে একদিকে যেমন দিল্লীর মসনদকে কেন্দ্র করে শুরু হচ্ছে নতুন ইতিহাস, অপরদিকে তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবিদগ্ধ বঙ্গভূমির শান্ত-সমাহিত জীবনেও সূচিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আলমগীর বাদশাহ দেহরক্ষা করলেন। তাঁর জীবিতকালেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূত্রপাত হয়েছিলো। এজন্য তাঁর অনুদার নীতি, হিন্দুবিদ্বেষ এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব একমাত্র দায়ী। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোল মুঘল মসনদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। আমীর ওমরাহগণের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রমূলক আগ্রাসী প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করলো মুঘলাধিপত্যের ধ্বংসকে। ইতিমধ্যে বিদেশাগত পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিককুল স্বর্গরাজ্য ভারতের যত্রতত্র নিজ নিজ শক্তি প্রসারে মত্ত হয়েছে। মুঘল মহলের অন্ধ যবনিকার তলে তলে শুরু হয়েছে তাদের দুরভিসন্ধিমূলক পদচারণা ক্রমশঃ বণিকের মানদণ্ড দেখা দিচ্ছে রাজদণ্ডরূপে। দিল্লীর এই ক্ষয়িষ্ণুকারের আঘাত সুদূর বঙ্গেও যে আসেনি তা নয়।

মুঘল শাসনাধিকারবিলুপ্তি বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বহন করে এনেছে নতুন দিনের আলোকবর্তিকা। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বঙ্গের জাতীয় জীবন মুঘলাধীনে থাকায় যতখানি শক্তি বা সামর্থ্যকে বিসর্জন দিয়েছিলো ঠিক ততখানি পরিবর্তন এল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে।

ইতিমধ্যে বাংলায় বারো ভূঞাদের শক্তিও ধূলিসাৎ হয়েছে। কুচবিহার, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরারাজগণের প্রতাপ হয়েছে অবলুপ্ত। আলমগীর-প্রেরিত মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ প্রমুখ অনেক আগেই স্বস্থানে ফিরে গেছেন। মৃত আলমগীরের পুত্র-পৌত্রদের সিংহাসন নিয়ে 'শবমাংসভুক্ প্রাণীর মতো কাড়াকাড়ি'র সুযোগে বঙ্গদেশ এক হিসেবে মুঘল আধিপত্যের বাইরে গিয়ে পড়েছে। চৈতন্য-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের এই কালে রচিত হয়েছে দ্বিজ বংশীদাস, বাইশ কবি, কেতকাদাস, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল প্রমুখ কবির মনসামঙ্গল; দ্বিজ রামদেব, দ্বিজ কমললোচন, ভবানীপ্রসাদ প্রমুখ কবির চণ্ডী ও কালিকামঙ্গল; কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল;

শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র প্রমুখের শিবমঙ্গল ; ময়ূরভট্ট ও রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল ; রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ইত্যাদি।

১৭০৭ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে বাঙালীর লোকায়ত জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই, ১৫শ—১৭শ শতকের দেবকৃপানির্ভর সমাজ যখন ১৮শ শতকে পদার্পণ করলো, তখন বঙ্গসমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তিটাই উঠলো নড়ে। একদিকে মুসলীম ও খ্রীষ্টান ধর্মবাদ প্রায় নিষ্ঠাহীন ও আচারসর্বস্ব হিন্দুয়ানাকে গ্রাস করতে চলেছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য প্রভাব ক্রমশঃ দেশের উপর জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে। লৌকিক জীবনের গভীরের দিকে তাকালে দেখি, একদা অনার্যকুল-পূজিতা দেবদেবীরা, যাঁরা উচ্চকোটির হিন্দুগণ কর্তৃক যথোপযুক্তভাবে পূজা বা শ্রদ্ধা কোনদিন পাননি, তাঁরা যেন এবার কুলে উঠলেন। গ্রামের বৃক্ষতল বা অবহেলিত প্রান্তর থেকে তাঁরা উঠে এলেন সুসজ্জিত ও সুরম্য মন্দিরে। এই দেবদেবীরা হলেন শীতলা, পঞ্চানন, ষষ্ঠী, সত্যপীর, ধর্মরাজ, কালুরায় ইত্যাদি।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের কালেই রচিত হয়েছে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কালজয়ী কাব্য। একটু নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের কাব্যখ্যাতিতে উদ্ভাসিত হলেও, গ্রাম-বাংলার প্রান্তে-উপান্তে বসে আরো অনেক কবি রচনা করে গেছেন কাব্যরাজি। এই সমস্ত অজ্ঞাত অখ্যাত কবিকুল হয়তো কোন বৃহৎ রাজশক্তির অনুগ্রহ লাভ করতে পারেননি। গ্রাম্য ভূস্বামী বা পত্তনীদারই ছিলেন এঁদের কাব্যচর্চার অনুপ্রেরক। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের বিরাটত্বের সামনে এই অজ্ঞাত ও বিস্মৃতপ্রায় পল্লীবাসী কবিগণের রচনা কালজয়ী না হলেও নিজেদের স্বাভাবদত্ত কবিত্বশক্তির স্ফুরণে এঁরা সার্থক হয়েছেন বহুলাংশে।

আমাদের আলোচনা পলাশীর যুদ্ধের কিঞ্চিৎ পূর্ব এবং পরবর্তী কতিপয় অজ্ঞাত এবং বিস্মৃতপ্রায় কবি ও কাব্য সম্বন্ধে। এঁদের কাব্যের পুঁথি আজও দক্ষিণবঙ্গের নানাস্থানে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, আর কেউ বা সৌভাগ্যগুণে খণ্ডক্ষুদ্রভাবে আলোচিত হলেও সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ থেকে আজও বঞ্চিত রয়েছেন।

**শঙ্কর** ॥ মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল মহকমার গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহকালে বর্তমান লেখক 'কবি শঙ্কর' ভণিতা বিশিষ্ট 'শীতলামঙ্গল', 'সারদামঙ্গল', 'কেশ্যারায় পালা', 'পঞ্চাননের গান,' 'গঙ্গামঙ্গল', 'কামাক্ষ্যার গীত', 'দিগ্‌বন্দনা' শীর্ষক কয়েকটি কাব্যের অনেকগুলি খণ্ডিত এবং সম্পূর্ণ পুঁথি হাতে পান। 'শীতলামঙ্গল' কাব্যখানি সুবৃহৎ। 'লঙ্কাপূজা', 'বিরাট জাগরণ' 'নিরধ্বজরাজার পূজা', 'রঘুদত্তের পালা' ও 'নিমাজগাতী' এই পাঁচখানি পালায় সমগ্র কাব্যখানি বিভক্ত।

'শঙ্কর' নামটি বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অজ্ঞাত নয়। ইতিপূর্বে আলোচিত শঙ্কর

চক্রবর্তী[১] বাঁকুড়া জেলার কুলচণ্ডার মানুষ। "শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন' কাব্যের কবি শঙ্করের বাসস্থান পালুয়াগ্রাম, 'গঙ্গার বন্দনা' রচয়িতা শঙ্কর মল্লভূমের মানুষ ছিলেন। এছাড়া শঙ্করাচার্য রচিত 'গুরুদক্ষিণা', শঙ্কর রচিত 'ধ্রুবচরিত্র', ও 'সত্যনারায়ণের পুঁথি', দ্বিজশঙ্কর কবিচন্দ্র রচিত 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ইত্যাদি কাব্যগুলির কথা বিদগ্ধজনমাত্রেরই বিদিত। ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শঙ্কর চক্রবর্তী নামক জনৈক কবির একখানি "শীতলামঙ্গলের" উল্লেখ করেছেন।[২] সমকালীন সাহিত্যের ইতিহাসে এই শঙ্করকে 'শীতলামঙ্গলের' খ্যাতনামা রচয়িতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৩] এঁর পিতার নাম মুনিরাম, পুত্র কুঞ্জবিহারী। মল্লভূমের পাহুয়া ছিল তাঁর বাসভূমি। তিনি একাধিক মল্লরাজের অনুগ্রহ লাভে ধন্য হন। তাঁর রচিত 'দাতাকর্ণ', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'ধ্রুবচরিত্র', 'শিবি উপাখ্যান', 'হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান' 'শিবমঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যের পুঁথি বিভিন্ন সংগ্রহশালায় দৃষ্ট হয়। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে প্রচলিত 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যের কবি শঙ্কর কবিচন্দ্রের নামও অজানা নয়।[৪]

কিন্তু যে শঙ্কর সম্পর্কে আলোচনা করছি তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি এবং এ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের কোথাও তাঁর নামপর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি। এ কথা বলার নানাধরনের সঙ্গত এবং বলিষ্ঠ কারণ সমূহ বর্তমান। সে কথায় পরে আসছি।

মুসলমান শাসক মুর্শীদকুলীখাঁর সময় সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৬৬০টি পরগনায় ভাগ করা হয়। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দক্ষিণাংশে ১০৪'১৯ বর্গমাইল এলাকায় প্রায় ২০০টি গ্রাম নিয়ে তৈরি হয়েছিলো চেতুয়া পরগনা।[৫] এ পরগনাটি ছিল সরকার মান্দারনের অন্তর্গত। উত্তরে শিলাবতী ও দক্ষিণে শাখা কংসাবতী নদীবেষ্টিত এই চেতুয়া পরগনার মধ্যবর্তী একটি গ্রামের নাম পশ্চিম মানিকা। গ্রামটি বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত। আমাদের আলোচ্য কবি শঙ্করের পূর্ব-নিবাস ছিল এই গ্রাম। 'বিরাট জাগরণ পালার' একস্থানে কবি বলেছেন :—

'সংগ্রাম দেবের সুত হরিদাশ দেব সুত
পশ্চিম মানিকা পূর্ববাস।
সুদাম দেব তার সুত পূর্ণশ্লোক গুণযুত
তাহার তনয় কৃষ্ণদাস॥
মাধবী জঠরে জন্ম সদা চেষ্টা গান কর্ম
চেতুয়া কলাইকুণ্ডে স্থিতি।

---

১. সাহিত্য-পরিষৎ পুঁথি, নং ১১৭৩।
২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম বর্ষ. ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৭।
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, পৃ. ৮০০।
৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৪তম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা।
৫. আইন-ই-আকবরী।

কংসাবতী নদীতীর পিযুস সমান নীর
যথা আদিষ্ঠান সরস্বতী ॥"

উদ্ধৃত ভণিতা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিম মানিকা গ্রামে বাস ছিল কবির পূর্বনিবাস। পরবর্তীকালে কবি বা তাঁর পূর্বপুরুষগণ কলাইকুণ্ড গ্রামে উঠে আসেন। কলাইকুণ্ড গ্রামটি তোদ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানান্তর্গত।

কবির পূর্বপুরুষগণ গায়েনের কাজ করতেন। তাৎকালিক বর্ধমান-রাজ ঐ গায়েন দলের সুকণ্ঠের গান শ্রবণ করে পরিতৃপ্ত হন এবং কবির পিতা কৃষ্ণদাসকে উপহার স্বরূপ প্রভূত ভূ-সম্পদ দান করেন। স্বভাবকবি শঙ্কর পরবর্তীকালে দেবী সরস্বতী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে "শীতলামঙ্গল" কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে কবি এক স্থানে বলেছেন—

"মাধবী জঠরে জন্ম সদা চেষ্টা গান কর্ম
বিরচিলা শীতলা মঙ্গল।
ব্রজমহনেরে দয়া দিবে চরণের ছায়া
মহাদেবী চিন্তিবে কুশল ॥
চেতুয়ার শেষ খণ্ড নিবাস কলাইকুণ্ড
যথা অধিষ্ঠান সরস্বতী।
শীতলার পদসেবি করেন শঙ্কর কবি
নায়কের চিন্তহ অগতি ॥"

কাব্যরচনার অনুপ্রেরণালাভ সম্পর্কে কবি বলেছেন—

"যশোদানন্দন দির্বনারায়ন
কুলি পণ্ডিত স্বাব।
তাঁর অভিমত শঙ্কর রচিত
পীরের কদম সেবি ॥"

সুগায়ক হিসাবে কবি শঙ্করের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল নানাদিকে। বর্তমান হাওড়া জেলার আমতা থানান্তর্গত কুলিয়ার তাৎকালিক প্রখ্যাত জমিদার চৌধুরী পরিবারের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। একদা জমিদার ঠাকুরদাস চৌধুরীর অনুগ্রহ লাভে কবি ধন্য হন। "শীতলামঙ্গলে"র এক স্থানে তিনি বলেছেন—

"পরগনা মণ্ডলঘাটে ভাটোরার সন্নিকটে
কুল্যা গ্রাম অতি মনহর।
সেই কুল্যাগ্রামে বাস চৌধুরী ঠাকুর দাস
পুণ্য শ্লোক দেবির কিঙ্কর ॥

তার পতিব্রতা নারী যোরে পুত্র স্নেহ করি
দিলা নানা বস্ত্র অলংকার।
শীতলা চরণ সেবি কহেন শঙ্কর কবি
দেবী তারে হল্য ধ্বজাধর ॥ "

রেশমের ফলাও ব্যবসা করে কুলিয়ার চৌধুরী জমিদারগণ আওরঙ্গজীবের আমল থেকেই সুবিশাল ভূ-সম্পদের মালিক হন। সেকালে চৌধুরীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা সারা দক্ষিণবঙ্গে অজ্ঞাত ছিল না। এঁরা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের যথেষ্ট সমাদর করতেন।

কবি শঙ্করের কাব্যরচনার কাল সম্পর্কে নানা সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ নেই। বোধ হয় আগামী যুগের বিদগ্ধ গবেষকমণ্ডলীর ভ্রম অপনোদনের জন্যই তিনি নিজ কাব্যে কাব্যরচনার সাল-তারিখের সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এমন কি কোথাও কোন প্রচ্ছন্ন প্রহেলিকার আশ্রয় গ্রহণ না করেই "লঙ্কাপূজা" পালার একস্থানে তিনি বলেছেন—

"সন এগার চুয়াল্লিশ সালে শুক্রবার সন্ধ্যাকালে
শুক্লপক্ষ ২৮ আশ্বীনে।
কাতরে শঙ্কর বলে ঝড়বৃষ্টি মহীতলে
শীতলা সহায় সেই দিনে ॥ "

বাংলা ১১৪৪ সনের ২৮শে আশ্বিনেই কবি বোধ হয় দেবী শীতলার অনুগ্রহ এবং স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। যাই হোক, ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বা তৎপার্শ্ববর্তীকালেই কবি শঙ্করের কাব্যসমূহ রচিত হয়েছিল একথা মনে করা নিতান্ত অমূলক নয়।*

॥ শঙ্করের "শীতলামঙ্গল" কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ॥

মর্তে নিজের পূজা প্রচার-মানসে দেবী শীতলা অনাথিনী ও জরাক্লিষ্টা বৃদ্ধার বেশ ধারণ করে কোমরে কলাইরূপী বসন্তের ঝুড়ি নিয়ে বিরাট রাজ্যে রাজা বীরসিংহের রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। ত্রিভুবনে সমস্ত দেবদেবী সসম্মানে মানবকুলের পূজা পান; কিন্তু শীতলার পূজা কেউ করে না, এতেই দেবীর অভিমান।

পথে পড়ে নিমা-জগাতির খেয়াঘাট। ঘাটের ঐ মাঝিদ্বয় দেবী শীতলার রোষানলে পড়ে। ফলে তাদের সন্তানগণ প্রবল বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

রাজপুরীতে নিদ্রিত রাজা বীরসিংহ স্বপ্নে দেখেন, মহামড়কে নিজ রাজ্য যেন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দেবী শীতলা ছদ্মবেশে রাজার শিয়রদেশে উপবিষ্টা। নিদ্রিত রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সামনে দেখতে পান জরাগ্রস্তা দেবীকে। কিন্তু এহেন কুৎসিত বৃদ্ধাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করতে তিনি নিতান্ত নারাজ। সর্বোপরি তিনি শিবের উপাসক। ক্রোধভরে রাজা তাড়িয়ে দেন দেবীকে। এবারেই শুরু হোল দৈব ও মানুষের সংগ্রাম। ক্রুদ্ধা দেবী শীতলা নিজ দাসী রক্তবতী ও অনুচর জরাসুরের পরামর্শে বীরসিংহ রাজার একমাত্র পুত্রকে

* ৪.১২.৭৩ তারিখে আকাশবাণী কলিকাতা থেকে প্রচারিত লেখকের বেতার ভাষণ।

বসন্তরোগ কবলিত করান। ভীত রাজা শীতলার কোপ থেকে পুত্রকে রক্ষা করতে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। রাজপুত্র মারা গেল। সারা রাজ্যে ক্রন্দনরোল। ক্রমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা রাজ্যে। অবশেষে রাজার ভুল ভাঙলো। দেবী আশ্বাস দিলেন রাজ্যে তাঁর পূজা-প্রচারের ব্যবস্থা করলে মৃত রাজপুত্র সহ অন্যান্য মৃত ব্যক্তিগণ পুনরায় তাদের প্রাণ ফিরে পাবে। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে রাজা বীরাসহ পূজা করলেন দেবী শীতলার। সেই থেকে মর্তে শীতলা পূজার প্রচলন হলো।

॥ শঙ্করের শীতলামঙ্গলের কাল নির্ণয় ॥

অনার্য সংস্কৃতি-প্রভাবিত 'করচরণহীনা সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী শঙ্খ বা ধাতু খচিত ব্রণ-চিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডলমাত্রাবশিষ্টা' ও বিস্ফোটক-বসন্তরোগনিবারণী দেবী শীতলার মাহাত্ম্য কীর্তন করে যে "শীতলামঙ্গল" কাব্য পরবর্তীকালে রচিত হয় তার শুরু যে ঠিক কবে থেকে তা বলা শক্ত। আয়ুর্বেদ গ্রন্থ 'ভাব প্রকাশের' সূত্র ধরে বলা যাবে, স্কন্দপুরাণান্তর্গত 'কাশীখণ্ড' থেকে দেবী শীতলার স্তব গৃহীত হয়েছে। কোন কোন শীতলা পূজারীগণ বলেন, শীতলাপূজা বিধান 'পিচ্ছিলাতন্ত্র' ও ধ্যান 'গরুড়পুরাণ' থেকে সংগৃহীত। যুগবিচারে 'স্কন্দপুরাণ' খুববেশী প্রাচীন সাহিত্যকর্ম নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর যে কালে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' বা 'খিল হরিবংশ' রচিত হয়েছিলো সে কালেই স্কন্দপুরাণের জন্ম। শীতলা অনার্য দেবী। বৈদিক সাহিত্যে তাঁর অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা আকাঙ্ক্ষাকর। এ দেবীর পূজা কেবলমাত্র বঙ্গদেশ নয়ও, ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত। যে ত্রয়োদশ শতককে সাহিত্যযুগবিচারে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব যুগ বলা হয়েছে (Age of origin) অর্থাৎ পরবর্তী দশকসমূহে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহের আকর গ্রন্থরাজি যে শতকে রচিত হয় সেকাল বা শতক 'স্কন্দপুরাণের' রচনাকাল বলে ধরলে 'শীতলামঙ্গল' কাব্য-ভাবনার সেই যে সূত্রপাত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।[৭] বৌদ্ধধর্মবাদের সঙ্গেও দেবী শীতলার সংশ্রব অনেকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জনৈক গবেষক বলছেন, "It is difficult to ascertain whether Hindus have taken Sitala from the Buddhistic Hariti or the Buddhists from the Hindu Sitala. I am inclined to think that the Hindus are the borrowers."[৮]

৬. The Cult of the Goddess of Small pox in West Bengal—A. Bhattacharya, Vide *Quarterly Journal of the Mythic Society*: XL III (1952), P.P. 55-59.

৭. *The Brihad Dharma Purana*: A Thirteenth Century Works of Bengal—R. C. Hazra (Vide *The Journal of the University of Gauhati*, Vol. IV, 1955).

৮. Discovery of Living Buddhism in Bengal: Mm. H. P. Sastri P. P. 20.

আবার অনেকে এ মত গ্রহণে অনিচ্ছুক।[৯] যাই হোক সমস্ত বিতর্ক ও বিচারকে আপাততঃ মস্তকে ধারণ করে বলবো, অনার্য পরিমণ্ডল বা লোকায়ত ধ্যানধারণা থেকে উদ্ভূত হলেও দেবী শীতলা পরবর্তী কালের পৌরাণিক সাহিত্যের যুগে পৌরাণিক স্বীকৃতিলাভ করেছেন। স্বাভাবিক কারণে 'স্তবকবচমালা'র শীতলা-স্তব বর্ণিত দেখা যায়

"নমামি শীতলাং দেবী রাসভাথাং দিগম্বরীম্।
মার্জনীকলসোপেতাং শূর্পালংকৃতমস্তকাম্॥
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাম্ ত্বামকামৃতবর্ষিণীম্।
গলগণ্ডগ্রহরোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং॥
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্।
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্ ॥
যস্তাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং তস্য মৃত্যুর্ণজায়তে।
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু কৃত্বা সংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকং ভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য না জায়তে॥"

এই নিবিড় ধর্মবিশ্বাস একদা ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—যে দেশে বসন্তাদি চর্মরোগের নিদারুণ প্রকোপ সেদেশের মানুষের মনে দেবী শীতলার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত করে তুলবে তা আর আশ্চর্যের কি? কিছুটা অনার্যবোধ, কিছুটা পৌরাণিক এবং কিছুটা দেবভক্তি মিশ্রিত হয়ে একদা বর্তমানের দেবী শীতলার সৃষ্টি করেছে।

এ পর্যন্ত সন্ধান নিয়ে যতদূর জানা গেছে, ১৪৯১ শকাব্দ ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তীকালে* মাণিকরাম গাঙ্গুলী 'শীতলামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন বলে সাম্প্রতিক এক গবেষণামূলক মন্তব্য থেকে অনুমান করা হচ্ছে।‡ অবশ্য ভাষার ধরন এবং বর্ণনার পদ্ধতি থেকে মাণিকরামের 'শীতলামঙ্গল' ঠিক ততখানি প্রাচীনত্বের দাবিদার হবে কিনা তা সুধীজনমধ্যে বিচার্য। এর পর কলিকাতার নিকটবর্তী নিমিতা গ্রামের কবি কৃষ্ণরামদাস ১৬০৮ শকাব্দ বা ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'শীতলা পাঁচালী' রচনা করেন।[১০]

---

৯ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস —শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৭৯১

* ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে ১৪৯১ শক বা ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন [Vide 'Indian Historical Quarterly', 1, 1925, P 185]

‡ 'দ্বাদশমঙ্গল', ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ( শান্তিনিকেতন, ১৯৬৬ )

১০. কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী—ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৮ )

[ কবি কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যকাল ও অন্যান্য বিষয়-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয় মাসিক 'কৌশিকী' পত্রিকার পৌষ '৭৯ সংখ্যায় এক সঙ্গত বিতর্ক এবং সমাধান উপস্থাপন করেছেন। ]

'শীতলামঙ্গলের' সার্থক প্রথম কবি শঙ্কর কাব্য রচনা করলেন ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। ভণিতায় কবি বলেছেন—

"সন এগার চুয়ালিশ সালে শুক্রবার সন্ধ্যাকালে
শুক্রবার ২৮ খাশীনে।
কাতরে শঙ্কর বলে ঝড় বৃষ্টি মহীতলে
শীতলা সদয় সেই দিনে॥"

কবি শঙ্করের 'শীতলামঙ্গলের' বিভিন্ন পালার জীর্ণ তুলটের পুঁথিগুলি পাঠকালে বিশ শতকের সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যকে বড় বেশি করে মনে পড়ে যায়—যে কথাসাহিত্য হাস্যরস, করুণরস, সমাজচিত্র, ব্যক্তি-চরিত্র বর্ণন প্রভৃতি গুণে সমকালীন সাহিত্যস্রোতে অদ্বিতীয়। বিশ শতকের এই দশকে জন্মালে শঙ্কর একজন উঁচুদরের কথাসাহিত্যিক হতেন নিঃসন্দেহ। তাঁর কাব্য পদলালিত্য, ছন্দগুণ, নানা রসবর্ণন প্রভৃতি গুণে একক, অদ্বিতীয় এবং সুন্দর।

বসন্তরোগে সন্তানদের মৃত্যু হলে পুরনারীগণ পুত্রশোকে অধীরা। এ চিত্র সুন্দরভাবে এঁকেছেন কবি—

"নগরের যত মেয়্যা এক ঠাঁই ভীড় হয়্যা
বাছা বল্যা কাঁদে উভরায়।
আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমন ঝড়ে
ভূমে পড়্যা গড়াগড় যায়॥
নগরে ক্রন্দন রোল কেহ না শুনয়ে বোল
কেহ কার গলা ধর‍্যা কান্দে।
নাহি বান্ধে কেশপাশ ঘন বহে উর্দ্ধশ্বাস
বিলাপ করয়ে নানাছন্দে॥
আমি অভাগিনী নারী পরাণ ধরিতে নারি
আমা ছেড়্যা গেলে কোনখানে।
শূন্য হৈল নিকেতন কোথা গেলে বাছাধন
অভাগিনী বাঁচিব কেমনে॥
কেহ শিরে হানে কর শূন্য হৈল মোর ঘর
ক্ষীরভারে দুটি স্তন ফাটে।
না দেখি তোঁহার মুখ বিদরিয়া যায় বুক
মা বল্যা বৈসহ নিকটে॥
কেহ শ্মশানেতে পড়ি ঘন যায় গড়াগড়ি
কেহ কান্দে গোঠে আর মাঠে।

কেহ জলে কেহ স্থলে কেহ বাছা বাছা বলে
না দেখ্যা মা-এর প্রাণ ফাটে ॥" পৃ. ।/০

সন্তানহারা জননীকুলের শোকদগ্ধ ও করুণ রসসিক্ত নিখুঁত বর্ণনার লিপিকর হিসাবে কবি শঙ্করকে আমাদের এক যথার্থ মরমী কবি বলে মনে হয়। পুরনারীদের বেদনাহত চিত্র অঙ্কনের কালে তিনি যেন তাঁর উত্তর বা পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক বেশি সার্থক হয়েছেন—

"কেহ বলে কোথা গেলে অভাগীর বাছা।
বিদার আমার বুক আপনার ইছা॥
কেহ বলে আর প্রাণ ধরিতে না পারি।
বাছা মোর কোথা গেলে কি করিলে হরি॥
জনক জননী কার বুক নাঞি বান্দে।
গুঙ্‌রিয়া বাছার গুণ বিনাইয়া কান্দে॥"

পরবর্তীকালে সৃষ্ট বাংলার কথাসাহিত্যে করুণ রসের যে প্রগাঢ় বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়, কবি শঙ্করকে তার অন্যতম উদ্যোক্তা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। অর্থনৈতিক ধনবৈষম্য, সামাজিক ভেদবুদ্ধি ইত্যাদির অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজিত যে মনুষ্যত্ব—তার মূল প্রোথিত রয়েছে শোক-দুঃখ-সুখ-হাসি-কান্নার গভীরে। সেখানে আর রাজা-প্রজা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। এই শাশ্বত জীবনাদর্শ শঙ্করের কাব্যে বোধ করি প্রতিচ্ছন্নে বিধৃত।

সেকালে রাজার প্রজার নানা ব্যাপারে বৈষম্য থাকলেও অন্ততঃ বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে বোধ হয় কোন ইতরবিশেষ-বোধ ঠিক ততখানি শক্তিশালী ছিলো না। শঙ্করের কাব্যে দেখি রাজা বীরসিংহের পুত্র প্রজাদের বালকপুত্রগণের সঙ্গে একই গুরুর কাছে বিদ্যাশিক্ষায় রত—

"যেখানে বালকসঙ্গে রাজপুত্র মহারঙ্গে
পাঠপড়ে গুরুসন্নিধানে।
কলাই পসরা লইয়া ঈশ্বরী বসিল গিয়া
কাতরে শঙ্কর কবি ভনে॥"

সমাজে ছিল নানা জাতির লোকের বাস। কে ছোট কে বড় এ নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি বাঙালীর প্রত্যন্ত প্রদেশের গ্রামজীবনে ততখানি প্রবল ছিলো না—

"গড়ের চৌদিগ বেড়ি বিচিত্র রাজার বাড়ী
ছাত্রিশ জাতি নিবসে তাহাতে।
ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ ভাট অনেক পণ্ডিত ঠাট
শহর বেড়িয়া চারিভিতে॥
তেলী তামলি মালাকার কামার কুমার আর
ধীবর কৈবর্ত সূত্রধর।

তেমনি মোদক বেন্তা স্বর্ণকার পূর্ণ (?)
আগরি অনেক মালাকর (?) ॥
শঙ্খবণিক বৈসে গোহালা তাহার পাশে
অরাণ্ডর ধরে জনে জনে।
ক্ষেত্রী রাজপুত কেঞা মোগল পাঠান মিঞা
লেকজাদা সেয়দের সনে ॥
হাড়ি হালালখোর কুঞ্জর বাজির জোর
দোকানী কাবাড়ী কান্দে জত।
ওলাউঠা জর জালা সন্তাকারে আরম্ভিলা
বসন্তে পড়িল কত শত ॥
প্রবেশে কাএস্তপাড়া যাহার বড়াই বাড়া
রজক নাপিত চারিভিতে।
মাসকাটা কাজীকার নবর আফটীয়ার
বসন্তে পড়িল দুখে দুখে ॥
বারুই বৈসে দেশে বাইতি তাহার পাশে
সুড়ি বৈসে বাজারে বাজারে।
ভম গড়ের বার পটিদার সেকদার
চারি ভিতে বৈসে থরে থরে ॥
... ... ... ... ... ...
জোলা তাঁতী করঙ্গা খোড়ই।
রুগী বৈসে বেচে কানা (?) কত জাতি বৈসে নানা
খোইরি নগরে বেচে খোই ॥ ”

সমাজচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্যক্‌বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য বসন্তরোগ এবং জ্বরের নাম কাব্যমধ্যে বর্ণনা করেছেন। এ দেখে মনে হয় কবি বোধ হয় চিকিৎসা বিদ্যাতেও কম পারদর্শী ছিলেন না। সেকালটা ছিলো ম্যালেরিয়ার একাধিপত্যের যুগ। আয়ুর্বেদ গ্রন্থসমূহে এ সমস্ত রোগের অসংখ্য নাম মেলে—যেমন ধূলহালি, বাতজ্বর, পিত্তশূল, দুগ্ধজ্বর, পাথরী, তুকুল্যা, ধুকুল্যা, রাতচরা, কুয়াজ্বর, বিষমজ্বর, আবাজ্বর, পীলাজ্বর, আমরসজ্বর, একোয়া, পালিজ্বর, আদিজ্বর, আওয়া, ঝাছয়া, শিবজ্বর, কুজ্বর, বায়ুপিত্ত ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে রচিত শ্রীবল্লভের ‘শীতলামঙ্গল’ ১১ কাব্যেও অসংখ্য জ্বরের নাম মেলে। শঙ্করের কাব্য থেকেই বল্লভ এসমস্ত নাম সংগ্রহ করেছিলেন কিনা কে জানে! ইতিপূর্বে ধর্মমঙ্গলের খ্যাতনামা কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলীও[১২] অসংখ্য রোগের

১১. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩২-৫১

১২. Indian Historical Quarterly : 1 (1925) [ Work ot Dr. Muhammad Sahidullah ].

নাম নিজকাব্যে বর্ণনা করেছেন। শঙ্করের কাব্যে দেখি তিলা, মসুরিয়া, মুগাই, বেউচ্যা, চারিভা, ভমুরা, মর্জমুণি, নীলমণি, কলাছড়া, পদ্মফুল, আলকুশা, কুচট্যা, কাঁটাসার, পাথর-বারা, গুভাগড়া, ধুকুড়্যা, চাটাধুকুড়্যা, চামদল, কালচিমটি, মিলমিলা, পড়ামসুরিয়া ইত্যাদি চৌষট্টি রকম বসন্তের নাম। এসব দেখে মনে হয় কবি চিকিৎসা বিদ্যাতেও বোধ হয় কম পারদর্শী ছিলেন না। বসন্তরোগের প্রাথমিক লক্ষণ সম্বন্ধে কবি বলেন—

"জরাশুর আরম্ভিল শুন তার কথা।
কফজরে সবাকারে ধরে মাথাব্যথা॥"

বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতেও শঙ্করের দখল বোধ করি কম ছিলো না। ভাগবতের কাহিনীমালার সঙ্গে ছিল তাঁর সম্যক্ পরিচিতি। দেবী শীতলার কোপে পতিত রাজা বীরসিংহ নিজ পুত্রকে বসন্তের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্ম পর্বতের নিকট কাতরে আশ্রয় প্রার্থনা কালে পর্বত সকাশে বলেন—

"নাম তব শৈলরাজ সাধহ আপন কাজ
বিপত্তে করহ পরিত্রাণ।
ভারবতারণ আসে ব্রজপুর পরকাশে
জনম লভিল ভগবান॥
একদিন গোপগণে আসিয়া নন্দের স্থানে
যান সভে ইন্দ্র পূজিবারে।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে যান নন্দ মহানন্দে॥
গোবিন্দ নিষেধ কৈল তারে॥
শুন নন্দমহাশয় ইন্দ্রপূজা ভাল নয়
পূজা কর গিরি গোবর্দ্ধন।
পর্বত পূজিল সভে সকল আপদ যাবে
সুখে রবে গো বান্ধুর গণ॥
কৃষ্ণবাক্যে নন্দঘোষ পাই সুখপরিতোষ।
সভে পূজা করে গিরিবরে॥
কোপে ইন্দ্র মহারাজ সাধিতে আপন কাজ
ঝড় বৃষ্টি গোকুল নগরে॥
দারুণ বিষম ঝড়ে ঘন বজ্রাঘাত পড়ে
লোক পালায় সভে কম্পমান।
দেখি দেব চক্রপাণি গোপের আস্তরবাণি
বামকরে ধরে ভগবান॥

গোবর্দ্ধন গিরি ধরি রাখিল গোলকপুরি
গোপ গোপী তাহার ভিতরে।
গোপের বালক নারী ইন্দ্রপূজা বোধ করি
তোমাপূজ্যা গেল নিজপুরে॥"

হাস্যরস বর্ণনাতেও কবির প্রচেষ্টার অন্ত নেই। বসন্তরোগগণ যখন নিজ নিজ কৃতিত্ব ও ক্ষমতার কথা দেবীর সকাশে একে একে ব্যক্ত করে চলেছে, খোশ তখন বলে ওঠে—

"সভাকার পশ্চাতে বলিছে খোশরাজ।
আমি গেলে মনুষ্যের নাঞি থাকে লাজ॥
গণগর্বিত ভাশুর শ্বশুর নাই মানে।
সতত মগন মন শরীর কামড়ানে॥"

দেবী শীতলা, জ্বরাশুর, দাসী রামবতী, রাজা বীরসিংহ, রঘুদত্ত, নীলধ্বজরাজা, বিরাটরাণী, রাণীগণ প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনায় কবির প্রচেষ্টা উচ্চসাহিত্যরস অতিক্রান্ত। ঠিক যতখানি না বললে নয়, উচ্চ চরিত্রগুলি অঙ্কনে তার বেশি কথা কবি কোথাও বলেন নি।

যথাযথ এবং নিবিড় গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ হলে কবি শঙ্করের 'শীতলামঙ্গল' সম্পর্কে আরো নানা তথ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হবে নিঃসন্দেহ।

॥ শঙ্করের অন্যান্য কাব্য ॥

"শীতলামঙ্গল" কাব্যে শঙ্করের সমধিক সার্থকতা থাকলেও তাঁর রচিত অপরাপর কাব্যগুলিও কম সার্থকতার দাবিদার নয়। গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং ভগীরথের মর্তে গঙ্গা আনয়নের কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত তাঁর 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যের একটি ক্ষুদ্র কাব্যের পুঁথি দৃষ্ট হয়। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবি মাধবাচার্যের 'গঙ্গামঙ্গলের' তুলনায় শঙ্করের কাব্যটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকায়ের হলেও এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে কাব্যের সমগ্র কাহিনীই বর্ণিত হয়ে গেছে। পাঁচালী আকারে রচিত কাব্যটি বর্তমান অবসরহীন বাঙালী-জীবনের যেন উপযুক্ত সাহিত্য বিলাসের উপকরণ। ১৫টি ভুলটের পৃষ্ঠায় কাব্যটি নিবদ্ধ। 'পদ্মপুরাণের' সূত্র ধরেই কাব্যখানি লিখিত হয়েছে বলে কবি বলেছেন। কাব্যের কয়েকটি ভণিতা নিম্নরূপ :—

(১) 'কহেন শঙ্কর কবি গঙ্গা কর দয়া।
ব্রজমহনে গঙ্গামাতা দেহ পদছায়া॥' পৃ. ৮

(২) 'দাস শঙ্কর বলে গঙ্গাপদ ধ্যান।
সদাই শুনেন ইহা সেই পুণ্যবান॥' পৃ. ৯

(৩) 'কহেন শঙ্কর দাস কসাইকুণ্ডে ঘর।
দর্পনারাণে কুশল মাতা চিন্ত নিরন্তর॥' পৃ. ১০

আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিখানির পুষ্পিকা নিম্নরূপ :—

"ইতি শ্রীশ্রীগঙ্গার মঙ্গল পদ্মপুরাণে অধ্যায়সমাপ্তং ॥ ইতি জথাদৃষ্টং তথালিখীতং লিখকোনাস্তিদোসক ভিমস্যাপীরণেভঙ্গ মণিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ সত্তাক্ষর শ্রীকিছু আদিকারি সাকিম পরগণে কুজপুর খাজুরিগ্রাম পঠনার্থে শ্রীপঞ্চানন্দ মামা সাকিম বাকাকুল পরগণে কুজপুর সন ১২০৭ সাল তারিখ ১৮ ফাল্গুন রোজ শনিবার ॥"

বিদ্যা ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা বৈদিককাল থেকে যখন পৌরাণিক কালে এসে আবির্ভূতা হলেন তখন তাঁর শ্বেতশুভ্র বর্ণ, হংসারূঢ়া, বীণাপুস্তকধারিণী এই মোহময় রূপ বা গঠনের মৌলিকতার বিশেষ কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। এই দেবীর মহিমা- মূলক 'মঙ্গলকাব্য' সারদামঙ্গলের আদি রচয়িতা হিসাবে এ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার কিশোরচক পরগনার কবি দয়ারাম দাশের নাম অনেকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কবি শঙ্করের রচিত "সারদামঙ্গল" কাব্যখানি[১৩] কে যদি ১১৪৪ বঙ্গাব্দের সমকালে রচিত বলে ধরা হয় তবেএটিই প্রথম 'সারদামঙ্গল'। দুঃখের বিষয়, কাব্যখানি খণ্ডিত কীটদষ্ট থাকায় এর সমগ্র কাহিনীকে উদ্ধার করা যায়নি। তবে কবি কালিদাসের কাহিনীকে অবলম্বন করেই এটি রচিত।

বৃক্ষের ডালছেদন রত কালিদাসের প্রতি রাজগৃহ প্রত্যাগত অপমানিত ব্রাহ্মণগণ যখন তাঁর বিবাহের প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন এবং কালিদাস তাতে সম্মত হলেন, তখন—

"মুনিঞা আনন্দ হৈল দ্বিজ সভাকার ॥
নিজ নিজ দিল সভে বস্ত্র আভরণ।
মাথাল্য সুগন্ধি তৈল বস্ত্রমাল্য চন্দন ॥
পট্টবস্ত্র পরাইল সাল দিল গায়।
পামরি (?) কম্বল কেহো করিল মাথায় ॥
সগনাথ পট্টনিন ( অস্পষ্ট ) মুক্তানিবনীত (?)।
ত্তঘসারমনানিল (?) চৌবেষ্ঠ কাশিত ॥
সোনাবান্ধ্যা আসী হাথে বাজাবাঁধা পায়।
কালিদাশে সাজাইয়া সভে লইয়া জায় ॥" পৃ. ৩॥৴০

রাজকন্যা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে অপমানিতা। মহামূর্খ ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। অতিদুঃখে সে কাতরা—

"সুপণ্ডিত হবে পতি বাঞ্ছি নিরবধি।
অভাগী কপালে মূর্খ লিখিয়াছে বিধি ॥
বাসরে রাজার কন্যা কান্দে উচ্চস্বরে।
রচিল শঙ্কর কবি সারদার বরে ॥" পৃ. ৪।০

১৩. কাব্যখানি খণ্ডিত ও কীটদষ্ট অবস্থায় কবির বংশধরগণের গৃহ থেকে বর্তমান লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে।

শঙ্করের "সারদামঙ্গল" কাব্যের কয়েকটি ভণিতা নিম্নরূপ :—

(১) "চেতুয়া রসের কুণ্ড নিবাশ কলাইকুণ্ড
সদাই সারদা করেন কেলি।
প্রথতমূর্খরা ভাবি কহেন শঙ্কর কবি
ভাসামত রচিল পাঁচালি॥" পৃ. ।৵০ (৫)

(২) জল রাখি নিজস্থানে কালিদাস জায়।
সারদামঙ্গল কবি শঙ্করেতে গায়॥ পৃ. ।৵০ (৬)

খণ্ডিত ও কীটদষ্ট হওয়ার জন্য আলোচ্য পুঁথিখানির লিপিদান বা সামগ্রিক বর্ণনা প্রদান করা গেল না। তবে যেটুকু দেখা গেছে, তার মধ্যেই কবির সার্বিক সাফল্য দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করা যায়।

'মঙ্গলকাব্যের' কবিগণ কাব্যরচনায় প্রারম্ভে কাব্যের 'বন্দনা' অংশে যা লিখে গিয়েছেন, বঙ্গদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস-নির্মাণে সেই পদগুলি মহামূল্যবান। এই বন্দনা পর্যায়টিকে কবিগণ "দিগ্‌বন্দনা" বলে কাব্যমধ্যে উল্লেখ করেছেন। শঙ্করের 'দিগ্‌বন্দনা' কাব্যে রয়েছে অসংখ্য দেবদেবী এবং তাদের অধিষ্ঠান গ্রাম বা পরগনা গুলির নাম। উদাহরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া গেল -

"খেপুত চাপয়া বন্দো জয় খেপুেশ্বরি।
অপার মহীম জার কে বন্দীতে পারি॥
ত্রৈলক্যতারিণী গঙ্গা সুরধান মা।
সিমুমতী কিবা জানি মায়ের মহিমা॥
কালিঘাটের কালি বন্দো মস্তগের পাগে।
শীতের ভাল মন্দ গো তোমার পায় লাগে॥
শ্রীরাজবল্লবি বন্দো রাজবলহাটে।
দণ্ড চারিজন নিউরিবে শীতলাটে॥
বর্দ্ধমানের গড়ে বন্দো সবমঙ্গলা।
আসরে উরিয়া দেবি ছেড়্যা দেহ গলা॥" পৃ. ৬

"কেদারার পালা" নামক পাঁচালীর পুঁথিখান 'কেন্তারপালা' নামে বঙ্গদেশের জ্ঞান-পিপাসী সমাজে সমধিক পরিচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সংগ্রহশালায় এই পালার নানা কবির কাব্যের পুঁথি দৃষ্ট হয়। কবি শঙ্করের কেন্তারার পালাখানির মধ্যে যে নতুনত্ব আছে, এর কাহিনীটিই তার প্রমাণ। এক হিসাবে কাহিনীটি গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট এবং শব্দচয়নেও গ্রাম্যপ্রভাব যথেষ্ট কিন্তু কাব্যমূল্যের বিচারে এর সার্থকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। 'মদন' নামক

চরিত্রটির সুন্দর বিকাশ কাব্যখানিতে প্রদর্শিত হয়েছে। আমাদের হাতে শঙ্করের 'কেন্তারার পালা' কাব্যের একখানি বৃহৎ পুঁথি এসেছে। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১, যুগ্মপত্র সংখ্যা ১৬। পুঁথিখানি তুলটের। লিপিসাল ১২৪২ বঙ্গাব্দ। দীর্ঘ পুষ্পিকাখানি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক—

"ইতি সত্যপীরের জাগরণ সমাপ্তঃ॥ জথাদৃষ্টং তথালিখিতং লিক্ষকোদোষনাস্তি হস্তটল ত্রিপাদেন জুভাটল ত্রিপণ্ডিত ভিমস্বামী রণেভঙ্গ মণিনাশ্চ মতিভ্রমঃ ইতি সয়ক্ষর শ্রীবিপ্রদাস চক্রবর্ত্তি সাং বাগ্তাঘাট॥ পরগণে চেতুআ সন ১২৪২ সাল। তারিখ ৭ অগ্রাণ॥ গোকোটী দান গ্রিহণে শকাসী মাঘপৃয়াগে জদিকল্পবাসী সুমেরু সমগুর্ণ হিরণ্যদানং নহিতুল্ল তুল্ল গোবিন্দনাম॥ তেজপুত্র লঘুসঙ্গ ভঙ্গ সাধু সমাগম। কুলতাসঙ্গ দোসেন ভেকেন নিয়তাংকণি। জদিকাল কলং দুষ্টা তথিহাসনশি বানর। মহাবিক্ষ সমারুড়ে কিংরোদন্তি বানর॥ আপদর্ত্তে নরোদন্তি রোদন্তি মহাস্রয় তব গুণসিল জনামি কথসাধু বিড়ম্বনা॥ এবং এ পুস্তক জে চুরি করিবেক কিম্বা মাগিয়া নয়্যা জায় অস্তপী নাই দেই তাহাকে গো হর্ত্তা ব্রহ্মহর্ত্ত্যা স্ত্রী হর্ত্তার পাতক নাগে॥ এবং মাত্রি হরণ করে॥ এই মত তাল্লাক॥"

শঙ্করের "পঞ্চানন্দের পালা" নামক কাব্যখানির কাব্যমূল্য অসীম। কাব্যের প্রথমাংশের পদগুলির লালিত্য এবং শব্দযোজনা অতি সুন্দর:—

"চন্দ্রহাস নৃপধরে চন্দ্রভাগা নদিতিরে
চিন্তে সদা দেব চক্রপাণি।
কৃষ্ণ পাদ পদ্ম বিনে নাঞ্চি মানে অন্ত জনে
শুদ্ধমতি সদাসৎগিনি॥ (?)
প্রিয় প্রেমরস সুধা জীবন মোর্দ্ধব সদা
ঠাঞি নাম সংকির্ত্তন।
সকল ছাড়িয়া অর্চ্চা কেবল কৃষ্ণের চর্চ্চা
সাধু সঙ্গে সদত মিলন॥
এই মত নৃপবরে চন্দ্রভাগা * নদীতিরে
পালে প্রজা পরম আনন্দ।
সেদেশে বারইবুড়ি চিকির্চ্ছা জানএ বড়ি
তাহা না জানেন পঞ্চানন্দ॥
নৃপতির দেশে জেতে বাসনা ধরিয়া চির্ত্তে
পাত্র সঙ্গে করেন বিচার।
ব্রহ্মচারি বেসে হায় রাজারে ছলিতে জায়
দেখি ভক্তি কেমন রাজার॥" পৃ. ১

* বীরভূম জেলার একটি নদীর নাম

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর :[১৪]

'চণ্ডীদাস সমস্যার' ন্যায় বঙ্গসাহিত্যে অপর একটি নবতম সমস্যা সংযোজিত হয়েছে, তা হোলো 'কিঙ্কর সমস্যা'। মঙ্গলকাব্যধারার অনেক কবিই নিজ নিজ দেবভক্তিবশতঃ কাব্যের বিভিন্ন ভণিতায় নিজেকে 'কিঙ্কর' বলে নির্দেশ করেছেন। ফলে কাব্যখানি কোন্ কিঙ্করের লেখা তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কোন কোন পুঁথিতে কয়েকটি ভণিতায় কবির নিজস্ব নাম থাকে এবং কয়েকটি ভণিতায় 'কিঙ্কর' নামটি থাকে। সেই পুঁথিতে কবির আত্ম-পরিচয় দেওয়া না থাকলে সমস্যা জটিলাকার ধারণ করে। প্রবন্ধের মাসিক "সমকালীন"-এর আশ্বিন ১৩৭৯ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয় "কিঙ্কর, চন্দ্রচূড় ও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর" নামক সুন্দর একটি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ১৭শ শতকের ভাগবৎ প্রণেতা কবি বনশ্যামের উপাধি ছিল শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, কবি কাশীরামদাসের অগ্রজ কৃষ্ণদাসও ঐ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। জয়গোপাল দাশের ভক্তিভাব প্রদীপের অনুবাদক কবির নাম কৃষ্ণকিঙ্কর। ১৮শ শতকে 'পঞ্চানন পাঁচালী' রচয়িতা এক কৃষ্ণকিঙ্করের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়।

এঁর আরো কয়েকটি কাব্যের সন্ধান বিভিন্ন গবেষক দিয়েছেন। তাঁর শীতলামঙ্গল, লক্ষ্মীর গান, সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতি কাব্যের কয়েকখানি পুঁথিও গবেষকগণ আবিষ্কার করেছেন। আমাদের হাতেও তাঁর নানা কাব্যের বেশ কয়েকখানি খণ্ডিত এবং সম্পূর্ণ পুঁথি এসেছে।* সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত শেষোক্ত কৃষ্ণকিঙ্করই আমাদের আলোচ্য কবি।[১৫]

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের পরিচিতি প্রসঙ্গে নানাজনে নানামত প্রকাশ করেছেন। মেদিনীপুরের ইতিহাসলেখক যোগেশ বসু বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর মাইতি উপাধিবিশিষ্ট ছিলেন এবং নিজেকে মাহিষ্যকুলসম্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তীর মতে তিনি ছিলেন নমঃশূদ্র জাতীয়। গবেষক শ্রীপ্রশান্ত সোম [ কবি প্রণাম, বাগনান, হাওড়া/১৩৬৮, পৃঃ ২১ ] মহাশয়ের মতে হাওড়া জেলার আমতা থানার বর্তমান যণ্ডী গ্রাম কবির বাসভূমি ছিল তিনি জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ও অনুরূপ একটি মন্তব্যে

১৪. ইতিপূর্বে যোগেশ বসুর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস', ব্যতীত 'মেদিনীবার্ত্তায়' বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, 'হাবড়া চৈতন্য কলেজ পত্রিকায়' নিরঞ্জন চক্রবর্তী, 'কবি প্রণাম' ও 'বনেদী ঘর'-এ প্রশান্ত সোম, 'অহল্যা' পত্রিকায় মালীবুড়ো প্রমুখ গবেষকগণ শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। বিশদ আলোচনার জন্য মাসিক 'সমকালীন' জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ এবং আশ্বিন ১৩৭৯ দ্রষ্টব্য।

* লেখকের ব্যক্তিগত পুথি-সংগ্রহ।

১৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—শ্রীসুকুমার সেন।

বলেছেন, কবির লক্ষ্মী সরস্বতীর পুঁথিতে প্রদত্ত পরিচিতি অনেকাংশে মূল্যবান। অর্থাৎ তিনি যোগেশ বসুর মত অনেকখানি সমর্থন করেন।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের কাব্যরচনার কাল প্রসঙ্গেও গবেষকগণের মধ্যে নানা মত প্রচলিত কারও মতে নিরূপিতা কবির কাব্যরচনার কাল—

'মহীর পিঠে মহী দিয়া বেরা গিরিবর।
গগনে উঠিয়া গীত রচিল কিঙ্কর॥'

অর্থাৎ [ মহী = ১, গিরি = ৭, গগন = ০ ] ১১৭০ বঙ্গাব্দ কবির কাব্যরচনার কাল।

অপর এক সূত্রে কবির "শীতলামঙ্গল জাগরণ" পুঁথি অনুসারে

"ইন্দুমুখে মাটি চষে সমুদ্রে আকাশ ভাসে বড় এই অদ্ভুত কথন।
সেই সনে এই গীত কৃষ্ণকিঙ্কর বিরচিত শুনহ সকল সজ্জন॥"

[ মালীবুড়োর সংগ্রহ ]

ইন্দু = ১, মাটি = ১, সমুদ্র = ৭, আকাশ = ০, অর্থাৎ ১১৭০ সালে কবির 'শীতলা জাগরণ' পালা লিখিত হয়।

আমাদের প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের পুঁথিগুলিতে প্রদত্তকবির কাব্য রচনার কাল পূর্ববর্ণিত সাল-তারিখের সঙ্গে অনেকাংশে মেলে। "পঞ্চানন্দের গান" পালায় কবি বলেছেন—

"মহীর পিঠে মহী দিয়া গিরিবর।
গগনে উঠিয়া গীত রচিল কিঙ্কর॥"

অর্থাৎ, প্রহেলিকার অর্থানুসারে ১১৭০ সালে কবির পঞ্চানন্দ পুঁথি রচিত হয়।

বিভিন্ন গবেষকের মত এবং সদ্যপ্রাপ্ত পুঁথিগুলি পরীক্ষান্তে যদি বলা যায় যে, যে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ১১৭০ বঙ্গাব্দের কালে কাব্যসমূহ রচনা করেন তিনি যে মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুত গ্রামের মানুষ, তবে তা বোধ হয় দোষের হ'বে না। ইনি "শীতলামঙ্গল", "পঞ্চানন্দের গান", "দেবী লক্ষ্মীর গীত" নামক কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। এ পর্যন্ত নানা অনুসন্ধানে তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। বর্তমান মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার সীমান্তবর্তী মানকর ও চেতুয়া পরগনার মধ্যবর্তী হাড়োয়াচক মৌজায় কবির বাস ছিল। জাতিতে ছিলেন অব্রাহ্মণ [ কৈবর্ত/মাহিষ্য ]। শান্তিরাম আগমবাগীশ নামক জনৈক কবিত্বশক্তি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে এসে তিনি প্রথমে 'মনসামঙ্গলের' একখানি পালা লেখেন বলে কিংবদন্তী। তাৎকালিক সমাজপতি ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দুরূহ আগমশাস্ত্র পাঠ করতে হুগলী জেলায় চলে যান। পরে সেখান থেকে আগমশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ফিরে কবি স্বভূমি পরিত্যাগ করে তাৎকালিক বর্ধমানরাজ প্রদত্ত, ঘাটাল মহকুমার দাশপুর থানার ক্ষেপুত গ্রামের নিকট উত্তরবাড় গ্রামের ভূমিখণ্ডে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে কবির নামানুসারে ঐ ভূমিখণ্ডের নাম হয় 'কৃষ্ণবাটি' বা 'কিষ্টবাটি'।

আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি তাঁর বিভিন্ন পুঁথিতে যে সুদীর্ঘ পদসমূহ রচনা করেছেন, তা থেকে সেকালের দক্ষিণবঙ্গের অনেক খণ্ড-ক্ষুদ্র ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়। কবির কালে মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার মামকর ও চেতুয়া পরগনার অনেকগুলি গ্রাম যে প্রভূত সম্পদশালী ছিল, তা কবির বর্ণনা থেকেই পাওয়া যায়। ঐ স্থানের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের দিয়ে তিনি বলেছেন—

"ক্ষেপুত ভাটির তড়া　　গপালনগর শ্রীবরা
পঞ্চপাটে পঞ্চ ভট্টাচার্য্য।
দেহ অনুগ্রহ কবি　　এ পঞ্চ পণ্ডিত সেবি
তবে কৈল কবিতার ধার্য্য॥
রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য　　ভড়াবাসী বিদ্যাধুর্য্য
তাঁর আজ্ঞা করিয়ে পালন।
ভট্টসার্বভৌমবাসে　　রামায়ণ রচি শেষে
স্বপুস্তকে মন্দির দান॥
গণেশ ভট্টাচার্য্য ঋষি　　গপালনগরবাসী
শুক্রাচার্য্য মুনির সমান।
বুঝিয়া কবির হিত　　কৃপা করি যথচিত
তিনি মোর চিন্তিল কল্যাণ॥
ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য　　বৃহস্পতি বড় ধুর্য্য
শ্রীপাট শ্রীবরা নিবাসিত।
প্রথম কবির ভাগে　　তার আশীর্বাদ মাগে
শতদ্বিজ গোষ্ঠীর সহিত॥
বাঞ্ছারাম বিদ্যাবাগীশ　　গণে সিন্ধু যেন গিরিশ
পুত্র পৌত্র পণ্ডিত প্রবর।
ভাটরা ভবনে বসি　　অবিরত দিবানিশি
নানা শাস্ত্রে শিখালে বিস্তর॥"

তাৎকালিক বর্দ্ধমান রাজগণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কবি বলেছেন—

"বর্দ্ধমান অধিপতি　　কীর্ত্তিচন্দ্র নরপতি
চিত্রসেন পুত্র ধনুর্দ্ধর।
কীর্ত্তিচন্দ্র কণেষ্ঠ ভ্রাতঃ　　মিত্রসেন নরনাথ
তিলকচন্দ্র পুত্র রাজ্যেশ্বর॥
ভকতিতে তেজচন্দ্র　　স্বর্গের যেন রাজা ইন্দ্র
প্রতাপচন্দ্র তাহার নন্দন।

সে রাজার রাজাতুটে ক্ষেপতে ক্ষেপাই পাটে
কৃষ্ণকিঙ্কর করিল রচন ॥ ”

নিজের বংশপরিচয় দিতে গিয়ে কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর "শীতলামঙ্গল" নিমা-জগা-পুঁথিতে [ শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের সংগ্রহ ] বলেছেন :

"সাকিম ক্ষেপুত পরগণে মানকুর।
তিলকচন্দ্র রাজ অধিকারে নিজপুর ॥
শঙ্কর সন্ততি লক্ষ্মীকান্ত সুবিখ্যাত।
শূলপাণি সুত তস্যসুত জগন্নাথ ॥
তস্য সুত মুকুন্দ পিতা মাতা কাত্যায়নি। [ পাঠান্তরে 'কামামনি' ]
খুল্লতাত আনন্দ শ্রীমতি পিসীরাণি ॥
দীনবন্ধু নিমাই আদি চারি সহদর।
কনেষ্ঠ নারাণ কৃষ্ণা ভগ্নি একেশ্বর ॥
অর্জুন ভবানীশ্বর রামজয় দুর্গা।
গয়ারাম আদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুত বর্গা ॥
রাম বিজয়রাম দাতারাম মধ্যসুত।
কানাই (?) বলাই লক্ষ্মী কষ্ঠে মজুত (?) ॥
খোল্লতাত সুত বাসু সুত ত্রিলোচনা।
বিষ্ণুহরি কৃষ্ণদেব যুগল ভাগিনা ॥
শঙ্কর অগ্রজ নিজ করিয়া সন্ততি।
সত্যভামা রুক্মিণী কন্যা সুমিত্রা সুমতি ॥
গণগোষ্ঠি জাবন্ত (?) ঘোশিতা পরিবারে।
ভূত ভবিষ্যথ বর্ত্তমান সভাকারে ॥
বিষ্ণু পদতলে ব্রণময়ী দিবে স্থল।
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ভণে শীতলা মঙ্গল ॥ ”

নিমা-জগাতি পালার [ শীতলামঙ্গল ] অপর একটি পুঁথিতে কবি বলেছেন :

"রামগপাল ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য।
ক্ষেপতি নিবাসী পূজ্য সর্বরাজ্য ॥
নানা শাস্ত্রে উদ্দেশ আজ্ঞা কৈল মোরে।
রামহরি সুত ভট্টাচার্য্য নাতি তারে ॥
পঞ্চপাটে বন্দি এই পঞ্চ ভট্টাচার্য।
স্তবে ত করিল কবি কবিত্বের ধার্য ॥

সর্বময় মহাশয় সুকদেব রায় ।*
ক্ষেপুতিবাসী ক্ষেমেশ্বরির বরপুত্র পায় ॥
কবিত্ব সন্ধান যত শিখাইল মোরে
রামচন্দ্র পুত্র জুত প্রণিপাত তারে ॥
গোবিন্দরাম রাম শান্তি মুনিরাম
ক্ষেপতি থুকুড়দা কুলটিকরিতে ধাম ॥
এই চারি দ্বিজ বরে অনুজ্ঞান মোরে
কবিত্ব প্রকাশ কৈল ভারত ভিতরে ॥
লালবিহারী বাঞ্ছারাম বজ্রনাথ আর ।
শূদ্র জত জন কত নাম সব তার ॥
বিপ্রে বেদে শূদ্রে পদে রাখ প্রণমই
কৃষ্ণকিঙ্কর মাগে বর দিবে শীতলাই ॥ ”

কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের সমধিক খ্যাতি তাঁর 'পঞ্চানন্দের গান' নামক কাব্যে। কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

চন্দ্রকোণা পরগনার রাজা চন্দ্রকেতু শিবপুজোর উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়েছেন, দেখা হোল ব্রাহ্মণবেশধারী পঞ্চাননের সঙ্গে। পরিচয়কালে পঞ্চানন জানতে পারলেন যে পুত্রকামনায় রাজা দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ শিবপুজো করচেন। পঞ্চানন বললেন

'জিহো পঞ্চানন তিহো সদাশিব হন।
ভাব পঞ্চানন ভাই পূজ পঞ্চানন ॥
পঞ্চানন বলে তবে চক্ষু মুদ রাজা।
দেখাইব শিবমূর্ত্তি কর তার পূজা ॥'

রাজা তখন দেব পঞ্চাননের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। পঞ্চানন চন্দ্রকেতুকে একটি আম্রফল দিয়ে বললেন, এই ফল ভক্ষণ করলে তোমার স্ত্রী গর্ভবতী হবে। তবে তখন তোমাকে দেব পঞ্চাননের পূজা করতে হবে। একথা শুনে রাজা আম্রফলটি নিয়ে গৃহে ফিরলেন। রাজার দুইরানী চন্দ্রকলা ও সুমঙ্গলা উভয়ে আম্রটি ভক্ষণ করলেন এবং উভয়েই গর্ভবতী হলেন। যথাকালে প্রতি রানী অর্ধাংশ করে সন্তান প্রসব করলে রাজা মনের দুঃখে সেই অর্ধাংশ দুটি বিসর্জন দিতে চললেন। এমন সময় পুনরায় আবির্ভূত হলেন পঞ্চানন। তাঁরই করুণায় দুটি অর্ধাংশ মিলিত হয়ে একটি পূর্ণশিশু হোল।

মহানন্দে রাজা গৃহে ফিরে সারা রাজ্য জুড়ে উৎসবের আয়োজন করলেন। ভুলে গেলেন পঞ্চাননের পুজো দিতে। ছয়মাসকালে রাজপুত্রের অন্নপ্রাশন হোলো। ক্রমান্বয়ে

*প্রখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাসভূমি ছিল মেদিনীপুর ক্ষেপুতি গ্রাম। শুকদেব রায় উক্ত রায়বংশের পূর্বপুরুষ।

রাজপুত্র ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে কাশীরাজ অম্বালকের কন্যা চন্দ্রমুখীর সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা হোল। তবুও পঞ্চাননের পুজো হোল না। ক্রুদ্ধ দেবতা নিজের অনুচরদের সহযোগিতায় সমগ্র কাশীরাজপুরী ধ্বংস করে দিলেন। রাজপুত্রও প্রাণত্যাগ করলো। ওদিকে দুই রানী স্বপ্নে শুনলেন পঞ্চাননের নির্দেশ—আমার পুজো করলে রাজপুত্র প্রাণ ফিরে পাবে। যথাকালে সাড়ম্বরে দুই রানী পঞ্চাননের পুজোর আয়োজন করলেন। রাজপুত্র প্রাণ ফিরে পেলো। কাশীরাজপুরী আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল। এমনি করে মর্তে প্রচারিত হোল পঞ্চাননের পুজো।

আলোচ্য পুথির মধ্যে একটি আশ্চর্য ভণিতা লক্ষিত হয়- প্রথমোক্ত ভণিতায় কবি বলেছেন :

'বিভাপরাজ নরকশা প্রবেশিল ঘর।
কোপে কাঁপে পঞ্চানন রাচল কিঙ্কর॥'

কিন্তু পরবর্তী ভণিতায় বলেন :

"আশিয়া বেড়িল শব রাজার নন্দনে
ভাবিয়া ভৈরবনাথে চন্দ্রচূড় ভণে॥"

হঠাৎ আবির্ভূত এই 'চন্দ্রচূড়' যে কে তা রহস্যাবৃত। ইতিপূর্বে গবেষক অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয় একটি রচনায় সঙ্গত প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন [১৬]

"একটি বিষয় কৃষ্ণকিঙ্করের আলোচকগণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকিঙ্করের শীতলামঙ্গল ও পঞ্চানন পাঁচালীর বহুস্থানে 'চন্দ্রচূড়' ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— "বামে হস্তে অঙ্করেখ্যা বুঝ হে পণ্ডিত। চন্দ্রচূড় রচে কত সনের কবিত্ব।" বা "সদা শুকদেব দেবে শীতলাই বর দিবে পুত্রকন্যা রাখিবে কল্যানে। যুগল যুবতী প্রতি সুখে রাখ ভগবতি হাথে তালে চন্দ্রচূড় ভণে।।" এই চন্দ্রচূড় কে? অপর কোন কবি? না কবির আসল নাম চন্দ্রচূড়, কৃষ্ণকিঙ্কর উপাধি?"

এ প্রশ্নের একটি উত্তর দেওয়া গেল।

দেখা যাচ্ছে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কবিজন কাব্যের ভণিতায় অপর কোন নাম বা উপাধি ব্যবহার করলেও আত্মপরিচয় দেবার সময় যতদূর সম্ভব নিজ নাম ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, "অভয়ামঙ্গলের" কবি মুকুন্দরাম, "অন্নদামঙ্গলের" কবি ভারতচন্দ্র, "ধর্মমঙ্গলের" কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, "চণ্ডীমঙ্গলের" কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর নাম করা যেতে পারে। এই কবিগণ একাধিক ক্ষেত্রে কবিকঙ্কন, রায়গুণাকর, ধর্মদাস ইত্যাদি ব্যবহার করলেও আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বনাম ব্যবহার করেছেন। আমাদের আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর প্রসঙ্গে বলি, "কৃষ্ণকিঙ্কর" কথার অর্থ কৃষ্ণের দাস বা ভক্ত।

---

১৬. কিঙ্কর, চন্দ্রচূড় ও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর- অক্ষয়কুমার কয়াল [ সমকালীন/আশ্বিন ১৩৭৭, পৃ. ২৯৬।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শীতলা, সরস্বতী বা পঞ্চাননের প্রতি কবির যেরূপ ভক্তির প্রাবল্য, কৃষ্ণের প্রতি তাঁর তেমন ভক্তির দৃষ্টান্ত কাব্যসমূহের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং 'কৃষ্ণভক্ত' হিসাবে কবি নিজেকে উপস্থাপিত করার জন্য সচেষ্ট হননি। এটা নিতান্তই তাঁর নাম। আত্মপরিচয়মূলক সুদীর্ঘ পদগুলিকে কবি কোথাও 'চন্দ্রচূড়' ভণিতা ব্যবহার করেননি, ব্যবহার করেছেন কাব্যের কাহিনীর মধ্যে। সুতরাং চন্দ্রচূড় তাঁর উপাধি হতে পারে, কিন্তু নাম যে তাঁর শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর মাহীত [ জাতিতে মাহিষ্য/কৈবর্ত ] এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ আপাততঃ নেই বলে মনে করি।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের "শীতলামঙ্গল" কাব্যের (১) লঙ্কাপূজা, (২) বরুণপূজা, (৩) ইন্দ্রপূজা (৪) রাবণপূজা (৫) বিভাপালা (৬) জন্মপালা এগুলি কারও একার সংগ্রহে একত্রে নেই। কয়েক পালার নাম শ্রুত হয় মাত্র, কিন্তু দৃষ্ট হয় না। তবে জন্মপালা, বিভাপালা ও রাবণপূজা পালার পুঁথি অনেকেই দেখেছেন, সংগ্রহ করেছেন এবং পৃথক পৃথকভাবে আলোচনাও করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের কাব্যের অসংখ্য পুঁথি আজও দক্ষিণবঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সম্ভব। মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার অনেক 'শীতলামঙ্গল'-দল তাঁর পুঁথি ধরে গান করে বেড়ান, ছাপা বই-এর উপর নির্ভর করেন না। এই সমস্ত পুঁথি সংগ্রহ করা আশু প্রয়োজন। "শীতলার জন্মপালা' পুঁথিতে বর্ণিত দক্ষিণবঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চলের বিস্তাবস্তার পরিচিতিমূলক কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করে আপাততঃ শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর আলোচনার উপসংহার টানছি—

"মণ্ডলঘাট পরগনে মানকুর অনুবন্ধ।
বর্দ্ধমান চাকলা নরেন্দ্র তিলকচন্দ্র॥
কেপুত জাটরা তড়া গপাল নগর।
বন্দশুল শ্রীধরা সমাজ মনহর॥
সেই পঞ্চঘাটে পঞ্চ ভট্টাচার্য্য বন্দি।
তবে ত করিল কিঙ্কর কবিত্বের সন্ধি॥"

**প্রাণবল্লভ ঘোষ :**

ভগীরথের মর্তে গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে এ পর্যন্ত যতগুলি 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছে তন্মধ্যে কবি প্রাণবল্লভ ঘোষের "জাহ্নবীমঙ্গল" কাব্যখানির সাহিত্য-মূল্য অসীম। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই কবির ১৭৪টি তুলটের পাতার সুবৃহৎ কাব্যখানির পুঁথিটি আবিষ্কার করে পণ্ডিত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় সাহিত্যালোচক গবেষকদের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। পুঁথিখানির প্রাপ্তিস্থান মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রাম।

শায়েস্তা খাঁর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাংলার সুবাদারি লাভ করেন। এ সময় সম্রাট ঔরঙ্গজীবের অনুদার নীতির কালে সারা বাংলাদেশে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। সেকালে বাংলা-

দেশের এই বিদ্রোহের একাংশের নায়ক ছিলেন মেদিনীপুর জেলার চেৎ-বরদারাজ্যের অধিপতি শোভা সিংহ নামক এক ক্ষত্রিয় নরপতি। তিনি উড়িষ্যার পাঠান নায়ক রহিম খাঁকে এই বিদ্রোহে যোগ দিতে আহ্বান জানান। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়ের সঙ্গে সংঘর্ষকালে রাজা শোভা সিংহ ছাদ থেকে পতিত হয়ে পরোক্ষভাবে বর্ধমান রাজকন্যা কর্তৃক নিহত হন।[১৭] তবুও বিদ্রোহবহ্নি নির্বাপিত হয়নি। রাজমহল থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এক অঞ্চল বিদ্রোহীদের কবলে আসে। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তখন দুর্বল ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সেনাপতি নিয়োগ করে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। ফলে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়। পরাজিত রহিম খাঁ উড়িষ্যার জঙ্গলে পালিয়ে যান। এরপর নিষ্ঠুর শাসক ও প্রজাপীড়ক মুর্শীদকুলি খাঁ নবাবী লাভ করে কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন করতে শুরু করেন। সমগ্র বঙ্গদেশ তখন ১৩টি চাকলায় বিভক্ত। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিভিন্ন বিভাগের রাজকর্মচারীদের দেশের নানাস্থানে পাঠানো হয়। আমাদের আলোচ্য কবি প্রাণবল্লভ ঘোষ এরূপ একজন রাজকর্মচারী, যিনি একদা মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া বাসুদেবপুর অঞ্চলে ভূমি বণ্টন ব্যবস্থাকর্মে প্রেরিত হয়েছিলেন। কবির আদি নিবাস ছিলো বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার অন্তর্গত। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের পূর্বেকার যুগের কবি প্রাণবল্লভ ঐ বাসুদেবপুর গ্রামেই শেষ করেন তাঁর 'জাহ্নবীমঙ্গল' কাব্যরচনা। মুর্শিদাবাদ জেলার বন্দখানাতে এর রচনা শুরু হয়। প্রতি রাত্রে একটি করে পালা রচনা করে করে এটি শেষ হয়। কবির পিতার নাম বংশী। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

"অম্বিকানগরে স্থিতি কৃষ্ণপদে করি মতি
বিচরিল শ্রীপ্রাণবল্লভ ॥"

পুঁথির শুরু হয়েছে নিম্নভাবে—

"৺শ্রীশ্রী গঙ্গামঙ্গল লিক্ষতে
শ্রীগুরু চরণ পদ্মে বহুল প্রণতি।
আহার প্রসাদে তারি সকল দুর্গতি ॥
শৈল সুতা সুত গঙ্গা জেই লয় নাম।
সে জনার বিঘ্ন নাশ পূর্ণ মনস্কাম ॥" *

থি শেষ হয়েছে নিম্নভাবে—

গঙ্গার প্রভাবে সবে স্বর্গ কৈল বাস।
গঙ্গা গঙ্গা বল সভে সাঙ্গ ইতিহাস ॥

১৭. Bengal Past and Present : Vol. I [ July—Dec. 1969 ].

* পুঁথিখানি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বাসুদেবপুর গ্রামে পণ্ডিত পঞ্চানন রায় মহাশয়ের নিকটে আছে।

গঙ্গার চরণ সার ভরসা কেবল ।
শ্রীপ্রাণবল্লভ ভণে জাহ্নবী মঙ্গল ॥"

পুঁথিখানির পুষ্পিকার ঐতিহাসিকমূল্য কতখানি, তা পাঠ করলেই বোঝা যাবে—

"শ্রীগণেশায় নমঃ যথালিখিতং তথা দৃষ্টং লিখিকো নাস্তি দূষণং ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ শকাব্দা ১৬৪৬ তারিক ৫ জ্যৈষ্ঠ সন ১১৩১ সাল লিখিত শ্রীসিতারামদাসশূর সাকিম পরগণে আমুয়া সাঙ্গ হইল চেতুয়া পরগণাতে গ্রাম বাসুদেবপুর ॥ বেলা ছয় দণ্ড হইলে পুস্তক সাঙ্গ হইল। বাসাতে আসল শ্রীযুত বৃজবল্লভ রায় মুরশিদাবাদে বন্দখানাতে এ সময় লিখিবা হইল পরগণা হুন্দা বন্দবস্ত করিতে শ্রীযুক্ত নারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুক্ত বিশ্বাস...। এই পুস্তক সন ১১০৪ সাল তারিক ৫ পাঁচঞ্চি জ্যৈষ্ঠ তিথি অস্ত ত্রিতিয়া যুক্লাপক্ষ ॥"

"জাহ্নবীমঙ্গল" কাব্যখানি এগার দিন ধরে গাইবার জন্য রচিত, এতে মোট উনিশটি পালা আছে। প্রথম দুদিন নিশাপালা এবং তৃতীয় দিন থেকে দশম দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন দিবা ও নিশাপালা গাইতে হবে। কাব্যটির দীর্ঘতম পালা হোল "জাগরণ"। এর পালাগুলির নাম হোল যথাক্রমে (১) দেব সম্ভাষণ, (২) গঙ্গার জন্ম, (৩) বলি উপাখ্যান, (৪) ভগীরথ জন্ম, (৫) সগরবংশ পালা (৬) সৌদাসমুক্ত পালা, (৭) গৃধ্রপালা, (৮) ভেকভেকী পালা, (৯) বকীমুক্ত, (১০) কালকন্ন উপাখ্যান, (১১) প্রয়াগ মাহাত্ম্য, (১২) মাধব সুলোচনা পালা, (১৩) সুলোচনা হরণ, (১৪) মাধব স্বর্গবাস, (১৫) বারাণসী মাহাত্ম্য, (১৬) খণ্ডিত পালা (অজ্ঞাত), (১৭) কৃষ্ণনৃপ স্বর্গবাস, (১৮) গঙ্গার বিবাহ, (১৯) জাগরণ। পুঁথিখানির অংশবিশেষ জনৈক গবেষক কর্তৃক অপহৃত হওয়ায় এর কাহিনীর অংশবিশেষ খণ্ডিত হয়ে গেছে। বর্ধমান রাজ-প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

"যথায় ভূপতি বাবুরায়ের সন্তাতি।
কীর্তিচন্দ্র মহারাজ জগতে খেয়াতি ॥
তাহার জননী যতি কৃষ্ণপরায়ণী।
বহুরাজ্য সুশাসিত কৈল ঠাকুরাণী ॥
নবরত্নসম সভা জগতে বাখানে।
অবন অতুল বিপ্র তুষিলেন দানে ॥
তাহার আশ্রিত বংশী ঘোষের নন্দনে।
শ্রীপ্রাণবল্লভ ভণে গুরুর চরণে ॥"

মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের কবিকুলের পাশে কবি প্রাণবল্লভও স্থায়ী সম্মান লাভের যোগ্য। তাঁর মুকুন্দরামের মত গভীর জীবনদৃষ্টি ও চরিত্রচিত্রণ-ক্ষমতা, ভারতচন্দ্রের মত আলংকার চমৎকৃতি, বা রামেশ্বরের মত শব্দ প্রয়োজনায় দক্ষতা না থাকলেও কবিসুলভ সুরুচি ও শালীনতা এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা তাঁকে সমধিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

## ॥ শীতলামঙ্গলের কবি 'নিত্যানন্দ' : একটি বিতর্ক ॥

'শীতলামঙ্গলের' খ্যাতনামা কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রসঙ্গে 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' লেখক লিখেছেন - নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, 'উড়িয়া' নহেন, বাঙালী কবি। বাংলা ভাষাতেই তাঁর 'শীতলামঙ্গল' পাওয়া যায়।* বটতলা থেকে একদা মুদ্রিত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর 'বিরাট পালার' প্রকাশক ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত মহাশয়ের মতে, উড়িষ্যায় কবি নিত্যানন্দের পুঁথি এনে দত্তমহাশয় তা বাংলায় অনুবাদ করেন। 'দাশপুরের ইতিহাস' লেখক পণ্ডিত পঞ্চানন রায় নিত্যানন্দকে দাশপুর থানা এলাকার মানুষ বলেছেন। গবেষক চন্দ্র গুপ্ত বলেন, "মেদিনীপুর জেলার অধুনালুপ্ত চেতুয়া ও মানকর পরগণার সীমান্তবর্তী রূপনারাণের অদূরবর্তী কানাইচক গ্রামে কবির বাস ছিল।"** অপর এক গবেষক বলেন,[১৮] 'কবির জন্মভিটে মাড়োবেড় গ্রাম।' পূর্বোক্ত মতগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা লক্ষণীয়। নিত্যানন্দের উপর এ পর্যন্ত যতগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছে তা বেশির ভাগ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ব্যক্তিগত-ভাবে নিজেও নিত্যানন্দের অনেক পুঁথি সংগ্রহ করেছি, পাঠ করেছি, পরীক্ষা করেছি। সুতরাং এই শক্তি যদি দক্ষতার সার্থক নামান্তর হয় তবে কবির ভাষাতেই তাঁর আত্মপরিচয় দেবো –

> "বিদ্যারদসর্বশাস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণভবানী মিশ্র
> তস্যস্রুত মিশ্র মনোহর।
> তস্যসুত চিরঞ্জীব কি গুণে তুলনা দিব
> তার সখা প্রিয় দামোদর॥
> রাধাকান্ত তস্যসুত অশেষ গুণের যুত
> শ্রীচৈতন্য যাহার নন্দন।
> তাহার মধ্যম ভ্রাত নিত্যানন্দ নাম খ্যাত
> গায় ভেব্যা শীতলা চরণ॥"

কবির মূল বাসস্থান ছিল মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়ো থানান্তর্গত গোপালনগর অঞ্চলের মাড়োবেড়। পরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম কানাইচকে [ মতান্তরে খয়রা, নিজ খয়রা, খয়রাকানাই চক ] কবি নতুন বাসস্থান নির্মাণ করেন ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১৪১৮৯ সনন্দে কাশীযোড়ার রাজা রাজনারায়ণ প্রদত্ত ভূমিতে। তাঁর পদবী ছিলো মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে কাশীযোড়া পরগণার রাজা তাঁকে 'চক্রবর্ত্তী' উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রথমে কবির বংশ 'কুলীন ব্রাহ্মণ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তী বংশধরগণ কেউ কেউ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের যজনকার্য শুরু করেন। কবির বিখ্যাত 'শীতলামঙ্গল' কাব্যের 'স্বর্গপালা',

* বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস - শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৭৯৯

** মেদিনীপুর জেলার বিস্মৃত কবি ও কাব্য - চন্দ্র গুপ্ত [ প্রদীপ, ১৩।১১।৭২ ]

১৮. শীতলা-কিঙ্কর কবি নিত্যানন্দ - প্রসাদচন্দ্র হুদাইত [ রজত স্বাক্ষর, আশ্বিন '৮০ ]

'পাতাল পালা', 'লঙ্কা পালা', 'কিষ্কিন্ধ্যা পালা,' 'অযোধ্যা পালা' 'মগ পালা', 'গোকুল পালা' ও 'বিরাট জাগরণ পালা'র সবগুলি কারো একক সংগ্রহে বা কোন সংগ্রহশালায় একত্রে নেই। কোন কোন পালার পুঁথি কোথাও দেখা যায় না বলে অনেকেই বলে থাকেন। কাব্য-রচনার উৎস সম্বন্ধে মৎ আবিষ্কৃত একটি জীর্ণ লিপি থেকে পাই—

"নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর।
খয়রার সনিকটে কানাকিচকে ঘর॥
চণ্ডালের ব্রাহ্মণসে সর্বলোকে জানে।
বেনাপুর গিয়াছিল আপুন জজমানে॥
জজমান করিয়া নিতাই এসে নিজঘরে।
উপস্থিত হৈল নিতাই ঘাট রামকুরে॥
দালুকা জসড়াপূর্বে উত্তরে নদীখাম।
পশ্চিমেতে কাশিগড় দক্ষিণে মাচিনান॥
তার মর্দ্ধস্থলে এক আছে বারজলা।
সেইখানে দরশন দিলেন শীতলা॥
সেইদিন শীতলামা করে গেলেন ছলা।
দৈবযোগে ঝড়বৃষ্টি হৈল সন্ধ্যাবেলা॥
একটি পান দিয়া মাতা নিতাএর হাতে।
পান দিয়া ভগবতি গেলা আচম্বিতে॥
সন এগার একাশি শালে আটাসে আশ্বিনে।
শুক্লপক্ষ তিথি তায় শনিবার দিনে॥
সনেতে রাখিয়া সিমা রসে দিয়া বিধু।
নিত্যানন্দ রচে গান অক্ষরাক্ষরে মধু॥"

উদ্ধৃতাংশের শেষ দিকে প্রদত্ত প্রহেলিকাময় ভণিতার অর্থ করলে দাঁড়ায় ১১৬১ বঙ্গাব্দ [ সন=১, সিমা=১, রস=৬, বিধু=১, 'সিমা' শব্দটি লিপিকর-প্রমাদ হতে পারে। ওটি কোন কোন পুঁথিতে 'শিব' দেখা যায়। 'শিব' অর্থে 'রুদ্র'=১১। তাহলে 'সন' শব্দের কোন অর্থ হবে না ]। 'একাশি শাল' শব্দটিও লিপিকর-প্রমাদ। ওটি 'একষটি' হবে বলেই মনে হওয়া সঙ্গত। 'গোকুল পূজা' পালাতেও কবি বলেছেন

"সন এগার একষাটি আটাশা আশ্বিনে।
শুক্লাপক্ষ তিথি তার শনিবার দিনে॥"

ঐ পুঁথির অপর একস্থানে বলছেন—

"সনেতে রাখিয়া শিব রসে দিয়া বিধু।
নিত্যানন্দ রচে গান অক্ষরে অক্ষরে মধু॥"

সুতরাং এ সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুসারে বলা যাবে বাংলার ১১৬১ সালে কবির 'গোকুল পালা' পুঁথি রচিত হয়ে থাকবে। কবির অপর একটি পদ পাওয়া যায় বিক্ষিপ্তভাবে—

'পৃথিবী উপর পাতাল দিয়া রুদ্রে বিন্ধ্যা বাণ।
শরে কর‍্যা সুধাবৃষ্টি নিত্যানন্দ গান ॥"

রুদ্র=১১, বাণ=৫ এবং শর=৫ ধরলে ১১৫৫ সাল হবে।

কবি নিত্যানন্দ ছিলেন বর্তমান তমলুক মহকুমান্তর্গত অধুনালুপ্ত কাশীযোড়া পরগনার রাজা রাজনারায়ণ রায়ের সভাকবি। শীতলামঙ্গল কাব্যের ভণিতায় কবি বলেছেন—

"কাশীযোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তাহে রাজনারায়ণ ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ।
শীতলামঙ্গল রচে পান সুধামত ॥"

অথবা পাঠান্তরে—

"শ্রীকাশীযোড়াতে হরশঙ্করেতে
রাজনারায়ণ রায়।
তস্য সভাষতে রচে রসামৃতে
কবি নিত্যানন্দ গায় ॥"

বা,

"কাশীযোড়া মহাস্থান মহারাজা নরনারায়ণ
রাজনারায়ণ তাঁহার নন্দন।
তাঁহার সভায় রৈয়া শীতলা আদেশ পাইয়া
দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ ॥"

রাজা রাজনারায়ণের গ্রন্থরসিকতার নানা দৃষ্টান্ত মেলে। ইনি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এঁর আমলেই নিত্যানন্দের তাবৎ কাব্যসমূহ রচিত হয়।

'বিরাট পালা' কাব্যখানিতে নিত্যানন্দের সুনিপুণ কবিপ্রতিভার সুন্দর পরিচয় মেলে। শব্দচয়ন, অলংকার প্রয়োগ, ভাষা, ছন্দচাতুর্য, চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি গুণে কবির উৎকর্ষতা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর রচনা পাণ্ডিত্যের ভারে দুর্বোধ্য বা জটিল নয়, পক্ষান্তরে সহজ সরল। উদাহরণস্বরূপ মূল পুঁথি ( গোকুল পূজা ) থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃতি দিলাম—

"যুক্তি কর‍্যা নন্দ ঘোষ জশোদার সনে।
গোকুলের জীবন্ত ডাকিল গোপগণে ॥
যেরূপে ব্রাহ্মণী পূর্বে আল্য ভিক্ষাছলে।
সেসব সংবাদ নন্দ বিবরিয়া বলে ॥

নন্দ বলে যত্যপি পূজিব সিতলারে।
প্রতিষ্ঠা করিয়া আজি সভে জাহ ঘরে ॥
ব্রজপুরে বসন্ত হয়্যাছে জাকে জাকে।
কালি যদি কার গায় চিহ্ন নাই থাকে।
খির খয় ছানা দধি নানা উপহার।
মানৎ করিয়া দিব শত শত তার ॥
এতেক বলিয়া ঘর গেল গোপগণে।
কৈলাশে দেখিল দেবি রাস আরোহণে।।"

॥ **'সত্যনারায়ণ পাঁচালীর নতুন কবি'** ॥

সত্যনারায়ণ এক হিসেবে মিশ্রদেবতা। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ভক্তিভরে এই দেবতার পুজো করে থাকেন। 'সত্যপীর' নামে ইনি অহিন্দুগণে কর্তৃক পূজিত হন। এঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ইতিপূর্বে শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শীতলা মঙ্গলের কবি নিত্যানন্দ বা অন্যান্য কবিগণ পাঁচালী রচনা করেন। অনেক অখ্যাত কবিও সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছেন, যাঁদের আর দ্বিতীয় কোন কাব্যের পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এরূপ একজন কবি শিবরাম পাল।* প্রাপ্ত পুঁথি থেকে কবির ব্যক্তিগত পরিচিতি বা এ জাতীয় কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি। কোথাও এঁর সম্পর্কে কোন আলোচনাও দেখা যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ইনিও একজন নতুন কবি, অনালোচিত এবং অনাবিষ্কৃত। ১২টি তুলটের জীর্ণ পাতায় [ ৩″×১২″ [ পাঁচালীটি রচিত, পুঁথিখানির বয়স দু'শত সত্তর বছর [ লিপিসাল ১১১১ বঙ্গাব্দ ] তাই আলোচ্য কবি যে তারও অন্ততঃ ২০/২৫ বছর পূর্বে এ কাব্য রচনা করেন সে বিষয় নিঃসন্দেহ হওয়ায় যথেষ্ট কারণ আছে। বন্দনাপর্বে কবি শিবরাম এক স্থানে বলেছেন—

"লক্ষ্মি সরস্বতি বন্দো নোটাইআ খিতি।
কালিঘাটে কালি বন্দো আর ভাগিরথি ॥
বন্দিলাম নারায়ণ জোড় করি হাথ।
বলরাম সুভদ্রা বন্দো দেব জগন্নাথ ।
আত্তাশক্তি বন্দিলাম পরম হরিশে।
জার আজ্ঞায় ব্রহ্মা শিষ্টি করে অনায়াসে ॥"

একটি ভণিতায় কবি বলেছেন—

"শিবরামপাল কহে শুন সর্বজন।
অনুক্ষণ ভাব ভাই সত্যনারায়ণ ॥"

* পুঁথিখানি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে

পুঁথির ভাষা কিঞ্চিৎ প্রাচীন, অক্ষরের ছাঁদও প্রাচীনতা ঘেঁষা। কিন্তু কাব্যটির বর্ণনা অনেকাংশে প্রাঞ্জল এবং জড়তামুক্ত। সুললিত ত্রিপদী এবং পয়ার ছন্দের কয়েকটি বিভাগে কাব্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু রামেশ্বর বা অপরাপর 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচয়িতাদের তুলনায় শিবরাম অনেকাংশে হীনক্ষম এবং ব্যর্থকাম হয়েছেন বলা যায়।

* * * *

মঙ্গলকাব্যের অনালোচিত অধ্যায় আলোচনা করতে গিয়ে আরো কত বিতর্ক আর সমস্যা যে একে একে এসে আবির্ভূত হয় তার ইয়ত্তা নেই। পূর্বপ্রচলিত ধারণার পরিবর্তে একদিকে যেমন নতুন ধারণা সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হয় তেমনি অপরদিকে সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত খণ্ডক্ষুদ্র নথিপত্রও অতি সহজে পূর্বেকার সুপ্রতিষ্ঠিত কবি বা কাব্য সম্পর্কে নানা নতুন আলোকপাত করে বসে।

গ্রাম-বাংলায় ঘুরে ঘুরে যাঁদের পুঁথি সংগ্রহ করার নেশা আছে তাঁরা জানেন, আজো কত অবহেলিত পুঁথির অনাবিষ্কৃত স্তূপের মধ্যে মঙ্গলকাব্যধারার কত অজ্ঞাত কবির পরিচিতি ও কাব্যরাজি পড়ে রয়েছে। গ্রন্থাগারের বাইরে বিচরণের আগ্রহ গবেষকদের মধ্যে আরো অধিক বৃদ্ধি পেলে মঙ্গলকাব্যের এই অজ্ঞাত কবিরা অবশ্যই একদিন পাঠকের সামনে আবির্ভূত হবেন তাঁদের রচনাসম্ভার সহ। তাই আজ যাকে অনালোচিত বলে মনে হচ্ছে সেদিন তা বহু-আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়াবে নিঃসন্দেহে।

[ রচনাটির জন্য মূলতঃ লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের, হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি ও নথীপত্রের উপর নির্ভর করা হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলির বানান যতদূরসম্ভব পুঁথির মতই রাখা হয়েছে। শতাধিক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রাদি ও বিভিন্ন গবেষকদের অভিমতসমূহও গ্রহণ করা হয়েছে। ]

# চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ জীবনী ও সাহিত্যসাধনা

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রযুগে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিচিত্রমুখী সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারীরূপেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। চারুচন্দ্রের বিচিত্রবিষয়ী রচনাসম্ভারের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় তাঁর প্রতিভা বহুবিধ রচনার পথে প্রসৃত হয়েছিল। তিনি উপন্যাস লিখেছেন এবং তার সংখ্যা ২৭। ১। আগুনের ফুলকি (১৩২১), ১। স্রোতের ফুল (১৩২২), ৩। পরগাছা (১৩২৩), ৪। যমুনা পুলিনের ভিখারিণী (১৩২৪), ৫। দুই তার (১৩২৪), ৬। পঙ্কতিলক (মাঘ ১৩২৫), ৭। হেরফের (আশ্বিন ১৩২৫), ৮। চোরকাঁটা (আষাঢ় ১৩২৬), ৯। আলোকলতা (বৈশাখ ১৩২৭), ১০। দোটানা (শ্রাবণ ১৩২৭), ১১। বিয়ের ফুল (পৌষ ১৩২৭), ১২। মুক্তিস্নান (কার্তিক ১৩২৮), ১৩। সর্বনাশের নেশা (আষাঢ় ১৩৩০), ১৪। পারণ (১৩৩০), ১৫। ক্ষোভ-বিক্ষোভ (আষাঢ় ১৩৩১), ১৬। নোঙর ছেঁড়া নৌকা (শ্রাবণ ১৩৩১), ১৭। অদর্শনা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২), ১৮। রূপের ফাঁদ (১৩৩২), ১৯। নষ্টচন্দ্র (ফাল্গুন ১৩৩২), ২০। হাইফেন (ভাদ্র ১৩৩৩), ২১। মন-না-মতি (১৩৩৩), ২৩। যা নয় তাই (১৯২৭), ২৪। ধোঁকার টাটি (১৯২৯), ২৫। পথ ভোলা পথিক (১৯৩৩), ২৬। সুর বাঁধা (ভাদ্র ১৩৪৪) ২৭। অগ্নিহোত্রী (শারদীয়া ১৩৪৬)॥

ছোটগল্পের বই লিখেছেন ১১ খানি। যেমন—১। পুষ্পপাত্র (ভাদ্র ১৩১৭) সূচী: মধুস্রবা। সরমের কথা। সম্পাদকের বিপদ। লেখকের বিপদ। রহস্যের বিপদ। ভুল। রামধনের কীর্তি। কবরে আশক। প্রেমের নিরিখ। সেবিকা। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। বন্ধু ২। সওগাত (১৩১৮)। সূচী: একটি মেহেদির পাতা। প্রবাসী। মা। আমার ডাক্তারী। সাগর সঙ্গমে। মুক্তি। ভূতের ঘটকালি। অন্নসংস্থান। সাবধান। পরখ। সফল স্বপ্ন। মৃত্যুমিলন। সদানন্দের বৈরাগ্য। চায়া ওমা। দেয়ালের আড়াল। ৩। ধূপছায়া (১৩১৯)। সূচী: অপরাজিতা। চটির শাস্তি। ফিনিক্স। চীনদেশে। মেহেরচন্দ্র। খুনে। স্ত্রীচরিত্র। কুড়ুনি। জীবননাট্য। নিষ্কৃতি। নষ্টোদ্ধার। নীলকুঠি। গোঁপ খেজুরে। পূজার ঘণ্টা। ৪। বরণডালা [কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৩২০)]। সূচী: ফুলওয়ালী। সুন্দরী। অক্ষয়কবচ। বিদেশীর বে-খাতির। আমন্ত্রণ ও বিসর্জন। যশের পন্থা। পণরক্ষা। চাঁদির জুতো। মনের মতন। রস ও রসুই। ৫। চাঁদমালা

(১৩২২)। সূচী : পূজার প্রতিমা। বায়ু বহে পূরবৈয়া। গুণী। চুড়িওয়ালা। পিঞ্জরের বাহিরে। সতীন। পোস্টকার্ড। বরপণ। বজ্রাহত বনস্পতি। রঙের ছোপ। ৬। মণিমঞ্জীর (কার্তিক ১৩২৪)। সূচী : মণিমঞ্জীর। বিশ্বাসঘাতকের অনুতাপ। সমুদ্রযাত্রা। মহামুস্কিল। গর্দভের গান। বার্লিন অবরোধ। দ্বন্দ্ব। আস্থা। নন্দনবান। প্রাণের দান। ৭। কনকচুর (আশ্বিন ১৩২৫)। সূচী : মমতার ক্ষুধা। ঘেন্না। শোধবোধ। প্রেমিকের পরিচয়। নীরব নিবেদন। সমস্যার মীমাংসা। দ্বৈতাদ্বৈত। ক্ষ্যাপা। চোরের ছোটবড়। ফুলের ডাক। ৮। পঞ্চদশী (১৩৩১)। সূচী : সালঙ্কার কঙ্কাল। অবাক কাণ্ড। দাম্পত্য কলহে। প্রতিজ্ঞাপূরণ। দুর্বিপাক। প্রথম ও শেষ। কবুল জবাব। ক্ষেপার খেয়াল। স্বয়ম্বরা। মোমের পুতুল। বন্ধু সম্মিলন। চোরের বৌয়ের কান্না। গাড়ির আড়ি। বাজপাখী। সুইডেনের গল্প-লেখক। কিসের পুরস্কার। ৯। বন-জ্যোৎস্না (ভাদ্র ১৩৩৫)। সূচী : পরাক্রমের পরিণাম। শঠে শাঠ্য। নবীন রাশিয়ার তিনটি ছোট গল্প। বিড়ালদূত। স্বর্ণ গর্দভ। প্রলয়ের পরে। ১০। শমীশাখা (ভাদ্র ১৩৪০)। সূচী : শমীশাখা। পরিতৃপ্ত। জয়। জাতরক্ষা। ১১। দেউলিয়ার জমাখরচ (ফাল্গুন ১৩৪৫)। সূচী : দেউলিয়ার জমাখরচ। প্রতিক্রিয়া। নরহত্যা। খুনোখুনির ব্যাপার। যোদ্ধমাতা।

বজ্রাহত বনস্পতি (ভাদ্র ১৩৪২), সদানন্দের বৈরাগ্য (আশ্বিন ১৩৪২), বায়ু বহে পূরবৈয়া এবং ব্যবধান (শ্রাবণ ১৩৪৩) —এ কখানিও চারুচন্দ্রের গল্পগ্রন্থ। কিন্তু চারখানি গল্পগ্রন্থ আসলে ১. পুষ্পপাত্র, ২. সওগাত ও ৩ চাঁদমালা—এই তিনখানি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলির পুনর্বিন্যাস।

'যাত্রা-সহচরী' চারুচন্দ্রের একটি গল্পগ্রন্থ। এর প্রথম গল্প 'যাত্রা-সহচরী' নতুন করে লেখা হয়েছিল—অর্থাৎ, নতুন সংযোজন। অন্য সব গল্পই চারুচন্দ্রের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পুষ্পপাত্রে'র। সূচী : যাত্রা-সহচরী। অপরাজিতা, চটির পাটি। ফিনিক্স। চীনদেশে। স্নেহহস্ত। খুনে। কুড়ুনি। জীবননাট্য। নিষ্কৃতি। নষ্টোদ্ধার। নীলকুঠি। গোঁপ খেজুরে। পূজার ঘণ্টা।

যে সব গল্প গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়েছে, তার বাইরেও চারুচন্দ্রের বহু ছোটগল্প ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছড়িয়ে আছে এবং তার সংখ্যাও কম নয়।

চারুচন্দ্র শিশুপাঠ্য গল্প লিখেছেন, কাব্য সঙ্কলয়িতার কাজ করেছেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন, নাটিকা রচনা করেছেন। বিচিত্র বিষয়ে তাঁর লেখনী যে পারদম ছিল তা এর থেকেই বোঝা যায়।

উপন্যাস ও ছোটগল্প ছাড়া তিনি যে সব বই লিখেছেন তার তালিকা নীচে দেওয়া হল :

কাদম্বরী (অনুবাদ)—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় লিখিত। ১৯০৯।

রবিনসন ক্রুসো (অনুবাদ) ১৯১০।

কাশীরাম দাসের মহাভারত ( সম্পাদনা ) ১৩১৭ ( ১৯১০ )।

বিষ্ণুপুরাণ ১৯১০।

সচিত্র পারস্য উপন্যাস ১৯১০।

রত্নাবলী ( অনুবাদ ) আশ্বিন ১৩১৮।

ভাতের জন্মকথা ১৩২০।

রাবেয়া ১৩২০।

ঈশপের গল্প ১৯১৫ ( ১৩২২ )।

বেদবাণী ( বেদ পরিচায়ক গদ্য-পদ্যময় গ্রন্থ )। প্যারীমোহন সেনগুপ্তের সহযোগিতায় লিখিত। কবিতাংশ প্যারীমোহন সেনগুপ্তের রচনা। আশ্বিন ১৩৩০।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—সম্পাদনা। দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২৪।

চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী ( প্রথম ভাগ ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২৫।

চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী ( দ্বিতীয় ভাগ ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২৮।

শূন্যপুরাণ—সম্পাদনা ১৩৩৬।

বঙ্গবীণা ( কবিতা-সংকলন )—ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৩৪।

মালিকা ( কবিতা-সংকলন )। ১৯৩৪।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য মহাজন পদাবলী ১৩৪১।

কুহু ও কেকা ( সম্পাদিত কবিজীবনী ও কাব্যাংশের টীকা সম্বলিত ) ১৩৪২।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস। ফাল্গুন, ১৩৪২।

রবি-রশ্মি ( পূর্বভাগে কবিত্ব উন্মেষ হইতে কল্পনা পর্যন্ত ) ১৯৩৮।

রবি-রশ্মি ( পশ্চিমভাগে ক্ষণিকা হইতে তাসের দেশ পর্যন্ত ) ১৯৩৯।

রবীন্দ্র সাহিত্য-পরিচিতি ১৩৪৯।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক। সূচী : কবীর। নানক। মীরাবাঈ। শ্রীচৈতন্য। রামপ্রসাদ।

১৯২১ সালে সে যুগের বিভিন্ন কথা-সাহিত্যিকরা মিলে 'বারোয়ারি উপন্যাস' নামে যে উপন্যাস প্রকাশ করেন, তার একাংশ রচনার ভার ছিল চারুচন্দ্রের উপর।

বারোয়ারি উপন্যাসের লেখক-সূচী : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, কেবলমাত্র মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় আবদ্ধ হয়ে আছে, এমন লেখার সংখ্যা চারুচন্দ্রের অনেক। সে সব লেখার মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যের যে সন্ধান

পাওয়া যায়, তা রীতিমত বিস্ময় উৎপাদক। এই সব লেখার মধ্যে রয়েছে গল্প ছাড়া নানা বিষয়ের নিবন্ধ, আর বেশ কিছু সংখ্যক কবিতাও। অল্প কয়েকটির নমুনা এখানে প্রদত্ত হল: প্রেম ও প্রতিমা '( কবিতা ) 'পূর্ণিমা', জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ ( চারুচন্দ্রের প্রথম রচনা ), বাঁধবল ( কবিতা ) 'পূর্ণিমা', শ্রাবণ ১৩০১, কি সাধ ( কবিতা ) 'পূর্ণিমা', আশ্বিন ১৩০১। মেঘদূত ( প্রবন্ধ ) 'আলো' ১৩০৬, মাঘ ( প্রবন্ধ )—'আলো' কার্তিক, ১৩০৬, ভাষারহস্য ( প্রবন্ধ ) 'আলো', মাঘ ১৩০৬, *লিখন সৃষ্টির ইতিহাস ( প্রবন্ধ )* 'ভারতী', ১৩০৮, *সাগর ( প্রবন্ধ )* 'প্রদীপ', আষাঢ় ১৩০৯, ভাষারহস্য—ভাষার উৎপত্তি প্রচলন ও উন্নতি ( প্রবন্ধ ) 'ভারতী', ভাদ্র ১৩০৯, পুরাতত্ত্বের কয়েকটি কথা : প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা : বহুবিবাহ : সহমরণ ( প্রবন্ধ ) 'প্রবাসী' ফাল্গুন, ১৩০৯, পৃথিবীর ইতিহাস প্রবন্ধ ), 'প্রদীপ', জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১০, ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিতের ইতিহাস প্রবন্ধ) 'ভারতী', আষাঢ় ১৩১০, কবিগুরু হেমচন্দ্র ( কবিতা ) 'প্রদীপ', আষাঢ় ১৩১০, সৌরজগৎ ( প্রবন্ধ ) 'প্রদীপ', আশ্বিন, ১৩১০, ঢাকার পুরাতত্ত্ব ( প্রবন্ধ ), 'প্রবাসী' পৌষ ১৩১০, ভাষার গঠন ও উন্নতি ( প্রবন্ধ ) 'ভারতী', মাঘ ১৩১০, কাব্যের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ( প্রবন্ধ ) 'প্রদীপ', শ্রাবণ ১৩১১, উদ্ভিদের দৃষ্টিশক্তি ( প্রবন্ধ ) 'প্রবাসী', পৌষ ১৩১৪, জ্যোৎস্নায় কবিতা প্রবাসী'. বৈশাখ ১৩১৯, অবিমারক ( নাটক ভাস প্রণীত নাটকের অনুবাদ ) 'প্রবাসী', বৈশাখ—ভাদ্র ১৩২১, প্রাচীন ভারতের রাজা মুকুট ও সিংহাসনের লক্ষণ 'প্রবাসী', চৈত্র ১৩ ৩, গণেশ ঠাকুরের কুলজী ( প্রবন্ধ ), 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩২৭, শিবঠাকুরের কুলজী ( প্রবন্ধ ) 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩২৭, সত্যেন্দ্র-পরিচয় ( প্রবন্ধ ) 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩২৯, দাদূ দয়াল ( প্রবন্ধ ) 'বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৩৭, বাউল ( প্রবন্ধ ), 'প্রবাসী', মাঘ-ফাল্গুন ১৩৩৯, ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন ( প্রবন্ধ ) 'প্রবাসী' পৌষ ১৩৪০, রবীন্দ্রনাথের নবাণী ( প্রবন্ধ ) 'বিচিত্রা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪। বঙ্কিম-স্মৃতি (প্রবন্ধ) 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৪৪, শরৎ-স্মৃতি (স্মৃতকথা) 'প্রবাসী', কার্তিক, ১৩৪৫।

প্রবাসী পত্রিকার পঞ্চশস্য, বেতালের বৈঠক, কষ্টিপাথর, দেশের কথা, চিত্র পরিচয়, মহিলা-মজলিস, ছোটদের পাততাড়ি এবং পুস্তক-পরিচয় বিভাগগুলিতে চারুচন্দ্র স্বনামে এবং ছদ্মনামে অসংখ্য লেখা লিখেছেন।

চারুচন্দ্রের পিতার নাম গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মুক্তকেশী দেবী। গোপালচন্দ্রের আদি বাসস্থান ছিল যশোহর জেলার মাগুরা সাবডিভিশনে। গোপালচন্দ্র ভগীরথজ শ্রীপতির গোষ্ঠী, শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, মেল ফুলিয়া। শ্রীপতির পরবর্তী পুরুষ দুর্গাদাস 'চক্রবর্তী' উপাধি প্রাপ্ত হন—'চক্রবর্তী' কুলপ্রাধান্যের দ্যোতক। পরবর্তীকালে এই বংশ রুদ্ররাম চক্রবর্তীর বংশ নামে খ্যাত। রুদ্ররাম, রঘুরাম ও রামকেশব—তিন ভ্রাতা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত রুদ্ররামের ভ্রাতা রামকেশব বংশীয়।

চারুচন্দ্রের নিজের হাতে লেখা যে বংশতালিকা তাঁর পারিবারিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত, তা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হল :

ভট্টনারায়ণ
|
আদিবরাহ
|
মহেশ্বর
|
ভগীরথ
|
শ্রীপতি
|
দুর্গাদাস চক্রবর্তী ( ইনি 'চক্রবর্তী' উপাধি প্রাপ্ত হন )
|
রাঘব চক্রবর্তী
|
জয়রাম চক্রবর্তী
|
কেশবরাম বা রামকেশব
|
আনন্দীরাম বিদ্যালঙ্কার
|
রামলোচন
|
কাশীনাথ
|
পীতাম্বর (ভজ)
|
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
|
চারুচন্দ্র
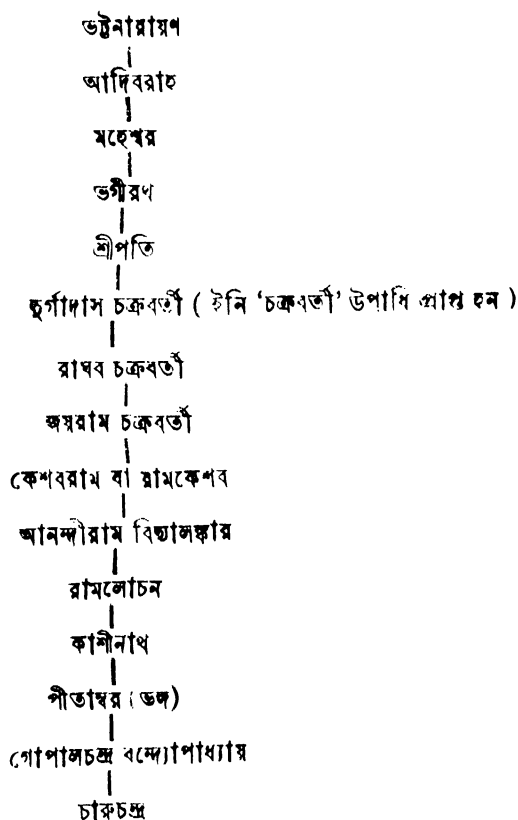
চারুচন্দ্রের জন্ম হয় ইংরাজী ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই অক্টোবর, বাংলা ১২৮৪-র ২৫-এ আশ্বিন, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। চারুচন্দ্রের মাতা মুক্তকেশী দেবী মালদহের অন্তর্গত চাঁচলের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরীর ভাগিনেয়ী ছিলেন। মুক্তকেশী দেবী বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের বড়রাণী মাতুলানীর কাছে ( রাণী সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ) মানুষ হন। বিবাহের পরে মুক্তকেশী ও গোপালচন্দ্র চাঁচলের রাজবাড়িতেই থেকেছেন। চাঁচলের রাজবাড়িতেই চারুচন্দ্রের জন্ম হয় এবং তাঁর বাল্য-শিক্ষালাভও ঘটে চাঁচলের রাজ স্কুলে।

অতঃপর ভাগ্যচক্রে চারুচন্দ্রের পিতাকে ত্যাগ করতে হয় রাজবাড়ি। হুগলী জেলার জিরাট গ্রাম ছিল গোপালচন্দ্রের মাতুলালয় –চাঁচল ত্যাগ করে তিনি জিরাট গ্রামে আসেন এবং সেখানেই বসবাস করেন। চারুচন্দ্র জিরাটের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বলাগড়ের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৯৪ সালে। অতঃপর তিনি কলকাতায় এসে পড়াশুনা শুরু করেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল এসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশান থেকে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ. এ. পাশ করার পরে চারুচন্দ্র বি. এ. পড়েন প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং সেখান থেকেই ১৮৯৯ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে

বি. এ. পড়ার সময়ে তিনি সাহিত্যানুরাগী হয়ে ওঠেন—তবে তখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

চারুচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা শুরু হয় তাঁর পাঠদ্দশাতেই। ১৩০১ সালে 'পূর্ণিমা' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর সেই প্রথম রচনাটি ছিল একটি কবিতা—নাম 'প্রেম ও প্রতিমা'। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে 'আলো', নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। কলেজীয় পত্রিকা হলেও পত্রিকাখানি বিখ্যাত ছিল। এই পত্রিকায় চারুচন্দ্রের কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যেমন ১. বঙ্কিম প্রসঙ্গ ( 'আলো', ভাদ্র ১৩০৬ ), ২. মেঘদূত ( 'আলো', আশ্বিন ১৩০৬ ), ৩. মাঘ ( 'আলো', কার্তিক ১৩০৬ )। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় চারুচন্দ্রের 'মেঘদূত' ও 'মাঘ' প্রবন্ধ দুটির প্রশংসা করেছিলেন।

এর পর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে চারুচন্দ্রের প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে লিখতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুচন্দ্রের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের ১৩০৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় 'দাবার জন্মকথা' নামে চারুচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। ১৩১০ সালের নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের আষাঢ় সংখ্যায় আমেরিকার কবি অলিভার ওয়েণ্ডেল হোলমসের The Old Man Dreams অবলম্বনে 'বৃদ্ধের স্বপ্নদর্শন' নামে চারুচন্দ্রের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি 'সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'—এই ছদ্মনামে প্রেরিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন জানতে পারেন যে চারুচন্দ্র ঐ কবিতার রচয়িতা, তখন তিনি তাঁকে বলেন যে উক্ত কবিতায় ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কবিতাটি তাঁর বিবেচনায় উৎকৃষ্ট।

চারুচন্দ্র তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন মালদহ জিলা স্কুলের হেডমাস্টার রূপে। তারপর সে কাজ ছেড়ে কলকাতার ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসের কার্যাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় কলকাতায় এই প্রকাশালয়টি খোলেন এবং চারুচন্দ্রকে এর কার্যাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন। সে সময়ে তাঁর সহকর্মী রূপে কাজ করেছেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ও সিউড়ীর সাহিত্যিক শিবরতন মিত্র মহাশয়।

কালকাতার ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে কিছুকাল কাজ করার পরে চারুচন্দ্রকে চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় এলাহাবাদে নিয়ে যান এবং তাঁর প্রেসের বাংলা গ্রন্থ-প্রকাশন বিভাগের ভার প্রদান করেন। এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান প্রেসে কাজ করার সময়ে চারুচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন কলাকাতায় এসে এখান থেকে প্রবাসী পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন, তখন

চারুচন্দ্র প্রবাসীর সহকারী সম্পাদকরূপে আহূত হন এবং চিন্তামণি ঘোষের অনুমতি গ্রহণ করে তিনি প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক হিসাবে উক্ত পত্রিকায় যোগ দেন।

ইণ্ডিয়ান প্রেসে কাজ করার সময়ে চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতিশয় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। চারুচন্দ্রের উদ্যোগেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সঙ্কলন 'চয়নিকা' প্রকাশিত হয় ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে ( প্রকাশকাল ১৯০৯ খ্রী )। চয়নিকার যে প্রথম সংস্করণ ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তার কবিতা সঙ্কলনও করেন চারুচন্দ্র। প্রথম সংস্করণ চয়নিকার ভূমিকাও রচনা করেন তিনিই।

প্রথম সংস্করণ চয়নিকার কবিতাবলী সাজানো হয়েছিল বিষয়ানুযায়ী বা ভাবানুযায়ী এবং এর প্রবেশক কবিতা ছিল 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে, গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে'। কবিতাগুলির শ্রেণীবিভাগ ছিল নিম্নলিখিতরূপ : কবিমানস, উত্তলা, রসরূপ, রূপক, বিশ্বপ্রকৃতি, মানব, কণিকা, অতীত, কথা, ভূমা, পরিণাম, গান। প্রথম সংস্করণ চয়নিকায় অনেকগুলি ছবি ছিল, তার মধ্যে একখানি ছবি রঙীন। ছবিগুলি নন্দলাল বসুর আঁকা। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম সংস্করণ চয়নিকা পেয়ে চারুচন্দ্রকে লিখেছিলেন :

প্রিয়বরেষু,

চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কিনা তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে জন্মাব তখন জানাব।— ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯।

প্রবাসীতে যখন চারুচন্দ্র কর্মরত তখন তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা বাংলায় ব্যাপ্ত। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বাংলায় এম. এ. পড়াবার ব্যবস্থা হল, তখন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চারুচন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান জানান। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মারফত আশুতোষের সে আহ্বান তাঁর কাছে পৌছয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা তখন আদৌ ভাল ছিল না। তৎসত্ত্বেও যৎসামান্য পারিশ্রমিকেই চারুচন্দ্র সার আশুতোষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বাংলা পড়াতে রাজি হন। এর পিছনে ছিল তাঁর সাহিত্যানুরাগ - আর সেই সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একটা আন্তরিক আকর্ষণ।

"ঐতিহাসিক দিক থেকে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের প্রথমতম অধ্যাপকদের অন্যতম। কেননা, যে বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এম. এ. খোলা হলো, সে বছরই তাঁকে আংশিক সময় অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্রের মতোই চারুচন্দ্র কখনো এম. এ. উপাধি অর্জন করেননি। তবু যে তিনি অধ্যাপনার জন্য আহূত হয়েছিলেন— প্রথমে কলকাতা, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে — এতে বোঝা যায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়িক মহলে তখন পর্যন্ত গুণগ্রাহিতা ছিলো নির্বোধ, ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি। মানতেই হবে এর পিছনে ছিল

সার আশুতোষের উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি যেমন দীনেশচন্দ্র সেনের যোগ্যতার মূল্য দিতে দ্বিধা করেননি, তেমনি দীনেশচন্দ্রও নিঃকুণ্ঠভাবেই আহ্বান জানিয়েছিলেন 'নেহাৎ সাহিত্যিক' চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে।"—এই কথাগুলি লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু ১৩৭৩ সালের 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায়।

যে সময়ে চারুচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন, তখন তিনি প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। দুটি প্রখ্যাত মাসিকের সম্পাদনা-কাজের জন্য তাঁকে মাসের পুরো সময় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হত। মাসের অর্ধেক দিন তাঁকে প্রবাসী পত্রিকার জন্য কর্মব্যস্ত থাকতে হয়েছে, প্রবাসীর বিভিন্ন বিভাগের জন্য নানা ধরনের লেখা লিখতে হয়েছে। মাসের বাকি অর্ধেক দিন তাঁকে মডার্ন রিভিউ পত্রিকার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। পত্রিকা দুখানির জন্য তিনি পুরো সময়ের জন্য নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিকভাবে অধ্যাপনার জন্য। সপ্তাহে তিন দিন তিন ঘণ্টার মত তাঁকে পড়াতে হত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুচন্দ্র পড়াবার জন্য বেছে নেন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি। আধুনিক সাহিত্যের একজন কথাসাহিত্যকার হয়েও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে তাঁর অধ্যাপনা-জীবন শুরু হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুচন্দ্রের অধ্যাপনার কাল ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুচন্দ্র যখন অধ্যাপনা করেছেন তখন তাঁর সৃষ্টিধর্মী লেখনী কিন্তু ক্লান্তি মানেনি, বা আদৌ বিরত থাকে নি। বরং বলা চলে যে, ঐ সময়েই তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার একেবারে কোটালের জোয়ার। তখন একদিকে তিনি প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ পত্রিকার কাজ করেছেন, পড়ানোর জন্য নানাবিধ তথ্যানুসন্ধানের পরিশ্রম করেছেন—পড়েছেন বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি—আবার অন্যদিকে এক এক করে লিখেছেন বারোখানি উপন্যাস, দুটি ছোট গল্পের বই এবং বারোয়ারি উপন্যাসের ১২।১৩ পরিচ্ছেদ। এ ছাড়াও তিনি ঐ সময়েই রচনা করেছেন একটি ছোট জীবনীগ্রন্থ নাম 'রাবেয়া' ১৩২৯ এবং 'বেদবাণী' ( বেদ-পরিচায়ক গ্রন্থ ) ১৩৩০।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চারুচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক পদ গ্রহণের আহ্বান পেয়েছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে চারুচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক এম. এ. উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৬-৩৮ দুবছর তিনি ঢাকার জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এই সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অনেক বই এবং নানা বিষয় পড়িয়েছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে সব বই পড়িয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত, বিদ্যাপতি, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি।

আধুনিক যুগের কাব্য-কবিতা ও গদ্যগ্রন্থ যা পড়াতেন, তা হল—বিহারীলালের সারদামঙ্গল, দ্বিজেন্দ্রলালের মন্দ্র, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত, সঙ্কলন, বিচিত্র প্রবন্ধ, বলাকা, চিত্রা, খেয়া প্রভৃতি। চয়নিকা পড়ানোয় তাঁর সবিশেষ খ্যাতি ছিল। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন "চয়নিকার যে কপিটি তিনি ক্লাশে ব্যবহার করতেন তার পাতায় পাতায় তাঁর স্বরচিত পাণ্ডুলিপি গ্রথিত ছিলো—বহু ব্যাখ্যা, উল্লেখ, ভারতীয় ও বৈদেশিক কবিদের সঙ্গে তুলনার অংশ এই সব ছিল ছাত্রদের জন্য তাঁর আয়োজিত নোট। পরবর্তীকালে সেই সব মন্তব্য পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে দুই খণ্ড রবিরশ্মি আকারে প্রকাশ করে।" 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩।

চারুচন্দ্র সাহিত্য সাধনা করেছেন, প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ—দুখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। ভারতী পত্রিকা সম্পাদনায় সরলা দেবীকে সাহায্য করেছেন।

চারুচন্দ্রের সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয় 'ভারতী' পত্রিকাখানিকে অবলম্বন করেই। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ সালে সরলা দেবী যখন ভারতীর সম্পাদিকা ছিলেন, সেই সময়ে চারুচন্দ্র তাঁকে ভারতী সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছেন। চারুচন্দ্রের সম্পাদনা কার্যের প্রশংসা করে কটক থেকে একবার সরলা দেবী লেখেন : "সকলেই একমুখে বলিতেছে, পৌষ মাস হইতে ভারতীর tone একেবারে বদলে গেছে। খুব ভালো লেখা বাহির হইতেছে। এই মন্তব্যটি আপনার এই কয় মাসের পরিশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করাইবে আশা করি।" (চারুচন্দ্রকে লিখিত সরলা দেবীর পত্র—৪ঠা মার্চ, ১৯০৪)। ১৯০৬ সালে লাহোর থেকে সরলা দেবী চারুচন্দ্রকে একটি প্রশংসাপত্র লিখে পাঠান—"শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৎসরাধিক কাল ভারতী সম্পাদনায় আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার কার্যতৎপরতা, সম্বন্ধে আমার ধারণা অত্যুত্তম।"

প্রবাসী যে এক সময়ে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ একখানি পত্রিকারূপে গণ্য ছিল, তা অনেকেরই জানা আছে। ১৩১৬ সালে চারুচন্দ্র প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। নামেই তিনি ছিলেন সহকারী সম্পাদক। আসলে পত্রিকা সম্পাদনার আগাগোড়া সমস্ত কাজই তাঁকে করতে হত। প্রবাসীর উৎকর্ষ দিনে দিনে বাড়িয়ে তোলার পিছনে চারুচন্দ্রের প্রাণপাত যত্ন অনেকখানি কাজ করেছিল। প্রবাসীর সম্পাদনায় চারুচন্দ্রের কর্মকৃতি এক অসামান্য রেকর্ড। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর উপর সমস্ত কর্মের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। রচনা নির্বাচন, যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ এবং সর্বোপরি মুদ্রণ-প্রমাদহীন পত্রিকাটি মাসের পর মাস বার করবার জন্য চারুচন্দ্রকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। প্রথম দিকে একমাত্র সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঔপন্যাসিক)

তাঁর সহযোগী ছিলেন। পরে প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (কবি), সুধীরচন্দ্র চৌধুরী ও হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় চারুচন্দ্রের সহযোগী হন।

রামানন্দবাবু কোন কোন মাসের শেষদিকে চারুচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে বলতেন - চারুবাবু আজ ত' মাসের ২৪ তারিখ—এখনো ত' অনেক বাকি। কাগজ ঠিক সময়ে বেরুবে ত'? উত্তর পেতেন—"চিন্তা করবেন না, কাগজ ঠিক সময়েই বেরুবে।" এ প্রতিশ্রুতির নড়চড় হয়নি কোন দিন। প্রবাসী মাসপয়লা বরাবরই বেরিয়েছে।

প্রবাসীতে যে সব লেখা ছাপা হত, তার প্রথম প্রুফ প্রেসের প্রুফ-রীডার দেখতেন। অতঃপর সব প্রুফ চারুচন্দ্র দেখতেন। বহু লেখার মধ্যে বহু স্থানে তাঁকে ভাষার ও শব্দ-বিন্যাসের, সময়ে সময়ে বানান সংশোধন করে দিতে হত। সমস্ত কাজই তিনি সুষ্ঠুভাবে, খুবই যত্নের সঙ্গে ও সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। এইরকম প্রাণান্তকর শ্রমসাধ্য কাজের পরেও চারুচন্দ্রকে প্রবাসীর জন্য প্রতি মাসে অনেকগুলি ফীচার লিখতে হত। যেমন - পঞ্চশস্য, বেতালের বৈঠক, কষ্টিপাথর, মহিলা মজলিস, ছোটদের পাততাড়ি, পুস্তক পরিচয়, চিত্র-পরিচয় ইত্যাদি। এই সব কাজের পরেও ছিল তাঁর অবিরাম উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার নিরলস গতি।

চারুচন্দ্র যখন প্রবাসীর সহ-সম্পাদক তখন তাঁর প্রভাবে, অনুরোধে ও চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান রচনা প্রবাসীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা প্রবাসী সম্পাদনার সূত্রে অতিশয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

১৩১৮ সালের ভাদ্র থেকে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ পর্যন্ত সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশিত হয়। জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে ছাপতে চাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে চারুচন্দ্রকে যে কটি পত্র দেন তা রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্রের মধ্যে মধুর অন্তরঙ্গতার নিদর্শন।

১.

প্রিয়সম্ভাষণমেতৎ,

বাঃ তুমি ত বেশ লোক। একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও। এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে—এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে হবে? সম্পাদক হলে মানুষের দয়ামায়া একেবারে অন্তর্হিত হয়, তুমি তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছ।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনটা থাক, তার বদলে ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই এবং বড়দাদার লেখাটাও পাঠানো যাচ্ছে।

একটা নতুন নাটক লেখবার চেষ্টায় আছি, দুই একদিনের মধ্যে শুরু করব।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.

শিলাইদা
নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আমার জীবনের প্রতি দাবী করে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ 'আপনার জীবনটা চাই।' এর পেছনে যদি কামান বন্দুক বা Haliday সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাকত তাহলে তোমার যুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকত না। তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধীনে থাকবে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্চে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি করেচ, না সম্পাদকীয় দুর্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্চ তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচিনে বলে কিছু স্থির করতে পারচিনে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন, অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি তা না জেনে তোমাদের মাসিক পত্রের Black and White-এ আমার জীবনটার এক গালে চুণ ও এক গালে কালি লেপন করতে পারব না। ইতি জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয়বরেষু

তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল। রামানন্দবাবুকে লিখেচি। কিন্তু অভিজ্ঞতের প্রবন্ধ শেষ হয়ে গেলে এটা আরম্ভ হলেই ভাল হয়। লোকের তখন জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বাড়তে পারে। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তরুণ লেখককে আবিষ্কার ও তাঁদের উৎসাহদান চারুচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। বনফুলের (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) প্রথম লেখা দুটি গল্প তিনিই প্রথম ছাপেন প্রবাসীতে—গল্প দুটির নামকরণও চারুচন্দ্র করে দেন বনফুলের অনুরোধে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম রচনাও চারুচন্দ্র প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন—"চারুবাবু ছিলেন প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক। ছেলেবেলায় আমি টলস্টয়ের একটি গল্প অনুবাদ করে প্রবাসীতে পাঠাই। সাহিত্যে সেই আমার

হাতে খড়ি। দিন কয়েকের মধ্যে উত্তর এল—পোস্টকার্ডের পিঠে পরিচ্ছন্ন কয়েক লাইন লেখা মঞ্জুর। ছাপা হবে। উত্তর যিনি দিয়েছেন তাঁর নাম এক কথায় 'চারু'।

আমি ত' পরম আপ্যায়িত।...তখনো আমি স্কুলের ছাত্র। পরের মাসে প্রবাসীতে রচনাটা সত্যি সত্যি বেরিয়ে গেল। ছাপার হরফে নিজের নাম দেখা সেই প্রথম। তাও প্রবাসীর মতো বনেদী মাসিকপত্রে। আর কি মাটিতে পা পড়ে! আমি তখন সপ্তম স্বর্গে।" অমৃত ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা সবুজপত্র অমনোনীত করলে চারুচন্দ্রই সে কবিতা ছাপেন প্রবাসীতে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"...প্রবাসীতে তখন আমার তিনটি গল্প ছাপা হয়েছে। চারুবাবুর একখানি চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন—"এবার যে গল্পটি আপনি পাঠিয়েছেন তার নাম আমি বদলে দিয়েছি। নাম দিয়েছি 'বলিদান'। আপনার সম্মতি আছে কিনা দয়া করে জানাবেন। আপনার গল্পের প্রশংসা না করে পারছি না। এত ভাল গল্প অনেকদিন পড়িনি।

সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেই চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চিঠি।

সেদিন সে চিঠিখানি ছিল আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ। চিঠিখানি আমার পকেটে পকেটে ঘুরেছে। যাকে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়িয়েছি।

পবিত্রকে (পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) দেখালাম সেই চিঠি। পড়েই সে আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললে, চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিস?

বললাম, না।

পবিত্র বললে, চল্ আগে সেখানেই যাই। তারপর যাব নজরুলের কাছে।" কালি ও কলম...প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা॥ ভাদ্র ১৩৭৪।

প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের প্রথম রচনা (কবিতা) চারুচন্দ্রই সর্বপ্রথম প্রবাসীতে ছাপেন। প্রথম বিশী মহাশয় তখন বালক তখন তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। প্রবাসীতে গল্প পাঠিয়েছিলেন। আশা করেননি যে ছাপা হবে। তিনি স্থির করেছিলেন বেনারসে চলে যাবেন এবং সেখানে ডাক্তারি পড়বেন। এমন সময় প্রবাসীর তরফ থেকে চারুচন্দ্রের পত্র পেলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর গল্প প্রবাসীতে ছাপা হল। ফলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনের গতি বদলে যায়। চারুচন্দ্রের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে সেদিন লিখতে শুরু করেন।

নতুন লেখকদের প্রেরণা ও উৎসাহ দানের ব্যাপারে চারুচন্দ্র নিজেই লিখে গিয়েছেন—

"মাসিক পত্রিকা পরিচালনার আদর্শ হওয়া উচিত নতুন প্রতিভার সন্ধান-সাধনা।

এই কাজেই নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি ব্যয় করেছি এবং কঠিন পরিশ্রমের মাঝে যখন কোন প্রতিভার সন্ধান পেয়েছি তখনই শ্রম সার্থক বোধ হয়েছে—মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মণি খুঁজে পাওয়ার মতই সে সার্থকতা আনন্দের।"

শুধু নতুন প্রতিভার সন্ধান চারুচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল না। নবোদিত সম্ভাবনাময় দীপ্ত প্রতিভাকে সূর্যালোকের সম্মুখে তুলে ধরাও ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এর মধ্যে ছিল না কোন স্বার্থচিন্তা, ছিল না কোন দলগত বা গোষ্ঠিগত মনোভাব। শুধু ছিল বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিচিন্তা। এ সম্পর্কে লখনউ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ অসিতকুমার হালদারের একটি পত্র উদ্ধৃত করি:

"আমার বেশ মনে আছে ১৯১৭ সালে যখন পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারু এবং আমরা কজন গয়া, প্রয়াগ, বরাবর গুহা প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন চারুর দ্বারাই সাহিত্য-জগতের দুটি মহৎ শিল্পীর পরিচয় ঘটেছিল। ট্রেন চলেছে—রবীন্দ্রনাথ বাইরের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে বসে আছেন। চলন্ত ট্রেনে রবীন্দ্রনাথের সামনে চারু শরৎচন্দ্রের পণ্ডিতমশাই বইখানি অতিশয় সন্তর্পণে রেখে দিলে। রবীন্দ্রনাথ বইখানি তুলে নিলেন এবং পড়া শেষ করে চারুকে বললেন—"চারু তুমি আজ আমাকে নতুন করে বাঙালীর মনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলে।" পর মুহূর্তেই তিনি শরৎচন্দ্রের বইখানির আদ্যোপান্ত মনস্তত্ত্বঘটিত বিশ্লেষণ করে গুণগান করলেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা এইভাবে চারুর দ্বারাই রবিরশ্মি-স্পর্শলাভের সুযোগ পেয়েছিল।"

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে যে শরৎ-রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে তাতে শরৎচন্দ্রের জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর লেখক গোপাল রায়। তাতে তিনি বলেছেন—

"শরৎচন্দ্র হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। পরিচয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে—ঠাকুরবাড়ীর বিচিত্রার আসরে। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।"

চারুচন্দ্র প্রবাসীর সহ-সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে তিনি 'ভারতী'-গোষ্ঠীর একজন লেখক বলেই পরিচয়লাভ করেছেন। কলকাতায় যখন তিনি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কার্যাধ্যক্ষ হয়ে তিনি কাজ করেছেন, সেই সময়েই তিনি বন্ধুরূপে পান মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতিকে। এ সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—কান্তিক প্রেসে ২০ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে আমাদের একটি আসর বসত নিত্য। চারুচন্দ্র এ সময়ে কলকাতায় থাকেন। প্রবাসীর সহকারী সম্পাদকতার ভার তখনো তিনি গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের ভার পেয়েছেন তখন ইণ্ডিয়ান প্রেস। তাঁরা এখানে দোকান খুলেছেন ২২/১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। চারুচন্দ্রের সঙ্গে এইসময়ে আলাপ এবং এ

আলাপ সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হল।—আসরে আমরা নিত্য সমবেত হতুম। সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাপান থেকে ফেরবার পরে আমাদের আসরে যোগ দেন এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসেন কলকাতায়—আমাদের ডেকে নতুন লেখা পড়ে শোনাতেন। তাঁর সঙ্গেও মেলামেশা চলত। তিনি আমাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশতেন যেন সমবয়সী বন্ধু। (রবীন্দ্র-স্মৃতি, পৃ. ১০২-১০৩)।

ভারতীর আসরে সাহিত্যালোচনা হত, স্বরচিত গল্প অথবা কবিতা পাঠ হত। সেখানকার প্রতি মুহূর্তটি ছিল সাহিত্য ও চারুকলা আলোচনার মুহূর্ত—কখনো আলোচিত হত বিশ্বসাহিত্য প্রসঙ্গ। কখনো পুস্তক পাঠ হয়েছে, কখনো সঙ্গীতের পরে সঙ্গীত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সাধারণত পাঠ করতেন কবিতা। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র পাঠ করতেন গল্প অথবা উপন্যাস। সমবেত কণ্ঠে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গান গেয়েছেন ভারতীর আসরে।

সেকালের বহু প্রবীণ ও নবীন লেখক ও শিল্পী সেখানে সমবেত হতেন। শরৎচন্দ্রও মাঝে মাঝে এই আসরে আসতেন। সাহিত্য ও কাব্যচর্চা ছাড়া ভারতীয় আসর বৈঠকী আড্ডা ও গল্প-গুজবের আবহাওয়ায় ছিল প্রাণবন্ত। ভারতী-গোষ্ঠীর অনুপ্রাণনা এসেছিল রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা সভা' থেকে। ভারতীগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে মিলনের ও নিবিড় অন্তরঙ্গতার ভিত্তিভূমিতে ছিল রবীন্দ্রানুরাগ।

ভারতীর আসর যখন বেশ জমজমাট, সেই সময়ে দেশে একদিকে যেমন রবীন্দ্রানুরাগীর একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে—তেমনি একদল রবীন্দ্রবিরোধীও আবির্ভূত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' নাটকখানি অভিনয় হবে সব ঠিক। কিন্তু ভারতী-গোষ্ঠী সেদিন 'আনন্দ বিদায়' নাটকখানির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেন তাতে ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। সেই আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন চারুচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ বিদেশের কাছ থেকে সম্মানলাভ করার আগেই—অর্থাৎ তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার (১৯১৩) আগেই তাঁর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এক রবীন্দ্রসম্বর্ধনার আয়োজন করেন। এর উদ্যোক্তা ছিলেন চারজন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও চারুচন্দ্র। রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার টাউন হল ১৪ই মাঘ, ১৩১৮। রবীন্দ্রসম্বর্ধনার মানপত্রটি রচনা করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়।

পরবর্তীকালে চারুচন্দ্র তাঁর বন্ধুবান্ধব-মহলে প্রায়ই বলেছেন—ভাগ্যিস সেদিন সাহিত্য পরিষদকে দিয়ে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা করান গিয়েছিল, তাতেই দেশের মান ও মুখ রক্ষা হয়েছিল। এই সম্বর্ধনার অল্প কয়েকদিন পরেই সে সময়কার সাতজন তরুণ রবীন্দ্রভক্ত রবীন্দ্রনাথের

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হন। এঁরা হলেন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতী-গোষ্ঠীভুক্তদের মধ্যে চারুচন্দ্রের সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গতা ছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। যদিও সে সময়ে 'চারু মণি-সত্যেন' এই তিনজনের নাম একসঙ্গে অনেকের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। চারুচন্দ্রের বাল্যবন্ধুদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহন সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কে শিক্ষক, গবেষক বা অধ্যাপকরূপে আনয়ন করার ব্যাপারে চারুচন্দ্রই ছিলেন অগ্রণী।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে চারুচন্দ্রের প্রথম পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় বাল্যে—ভাগলপুরে। তারপর সে বন্ধুত্ব আজীবন অটুট ছিল। শরৎচন্দ্র দুবার ঢাকায় যান। চারুচন্দ্র তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। শরৎচন্দ্র প্রথমবার ঢাকায় যান মুন্সীগঞ্জ থেকে। সেবার ১৩৩২ (১৯২৫) সালে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন হল। শরৎচন্দ্র ছিলেন সেই সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি। ঢাকা থেকে চারুচন্দ্রও গিয়েছিলেন সেই সম্মেলনে। সম্মেলনের শেষে মুন্সীগঞ্জ থেকে চারুচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্র ঢাকায় আসেন এবং তিনি যে কদিন ঢাকায় ছিলেন, সে কদিন চারুচন্দ্রের সঙ্গে তাঁরই বাড়ীতে বাস করেছেন। শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার ঢাকায় যান সাম্মানিক ডি. লিট্. ডিগ্রী গ্রহণ করতে। সেটা ১৩৩৪ সাল (১৯৩৬)। সেবারেও তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু চারুচন্দ্রের কাছেই তাঁর বাড়ীতে প্রায় দেড়মাস কাটিয়ে আসেন। চারুচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ববন্ধনের এগুলি হল উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। শরৎচন্দ্র যে দুবার ঢাকায় যান, সে দুবারই ঢাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে মাননীয় অতিথিরূপে পেয়ে ধন্য হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঢাকা স্টেশনে নেমে স্টেশনের উপর দাঁড়িয়েই বলেছেন—"নিজের বাড়ী থাকতে আমি অন্য বাড়ীতে উঠব কেন? চারুর বাড়ী মানেই আমার বাড়ী।"

ব্যক্তিগত জীবনে চারুচন্দ্র ছিলেন অতিশয় মিশুক, সদালাপী মজলিসি মানুষ। ছিলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একজন অতি একনিষ্ঠ অনুরাগী। অভিনয় ভালবাসতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অথবা ছাত্রীদের যে অভিনয়ই হয়েছে তার রিহার্সালে তিনি নিত্য-নিয়মিত উপস্থিত থেকেছেন। সেই সকল রিহার্সালে একদিনও অনুপস্থিত থেকেছেন এমন হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয়ের জন্য তৈরী করে দিয়েছেন প্রতিদিন অনেক রাত পর্যন্ত রিহার্সালে উপস্থিত থেকে। কয়েকবার অভিনয়ও করেছেন—তিনি সু-অভিনেতা ছিলেন। বৈকুণ্ঠের খাতায় তিনি বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। রমায় ( পল্লীসমাজ ) ধর্মদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শেষ রক্ষায় শিবচরণ ডাক্তার, ফাল্গুনীতে কবিশেখরের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেও কবির সঙ্গে নেমেছেন একবার। সাঁতার জানতেন আশ্চর্যরকমের ভালো। ইংরিজিতে যাকে বলে 'ফ্যান্সী সুইমিং'—তার বিচিত্র

প্রকারভেদ তাঁর জানা ছিল। সাঁতারু শান্তি পাল, প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতির ফ্যান্সী সুইমিং শিক্ষা চারুচন্দ্রের কাছে। কলকাতার হেদুয়ার সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের তিনি সভ্য ছিলেন নিয়মিত সেখানে সাঁতার কেটেছেন। একবার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৫০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে তরুণ সাঁতারুদের সঙ্গে সাঁতার কেটে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। হেদুয়ার সেন্টাল সুইমিং ক্লাবে বেশ কয়েকবারই ফ্যান্সী সুইমিং দেখিয়ে দর্শক-দলকে অবাক্ করে দেন।

অত্যন্ত উঁচুদরের সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। 'সর্বতোভদ্র' কথাটির যেন প্রতীকমূর্তি ছিলেন চারুচন্দ্র তাঁর আচার-ব্যবহারে একটা শোভনতা ছিল। ছাত্রেরা তো বটেই, যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁর চরিত্রমাধুর্য, তাঁর বিনয়নম্র আচরণে মুগ্ধ হয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের গভীর শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জন করেছেন তিনি। ছাত্রমহলে এমনই জনপ্রিয় ছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাঁকে ছাড়া নির্বাহিত হত না। সব রকমের সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও সহায়তা ছাত্রদের কাছে ছিল অপরিহার্য। ঢাকায় মুসলিম হলে মুসলমান ছাত্রদের মশায়েরা হয়েছে তার পৌরোহিত্যের জন্য বা উদ্বোধনের জন্য কোন মৌলবীকে ছাত্রেরা আহ্বান করেননি আহ্বান করেছেন চারুচন্দ্রকে। চারুচন্দ্র কোরান প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে সে অনুষ্ঠান সমাধান করেছেন। ছাত্রমহলে তাঁর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু লিখে গিয়েছেন—

"তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন—আর সেটাই শিক্ষক-জীবনের উচ্চতম সার্থকতা। বিদ্যার্থীদের মৌখিক ভক্তি সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের ভালোবাসা পেতে হলে বহুগুণের সমন্বয় চাই। শুধু পাণ্ডিত্য নয়, শিক্ষণীয় বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ, মনোহর ব্যক্তিত্ব, প্রসন্ন বাচনভঙ্গি, স্নিগ্ধ আচরণ এবং চারিত্রিক উদারতা। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এই সব গুণের সমন্বয় ঘটেছিলো।"—দেশ : সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭১।

নামের আগে চারুচন্দ্র 'শ্রী' ব্যবহার করতেন না ইংরেজরা নিজের নামের আগে কেউ কখনো 'মিস্টার' ব্যবহার করে না বলে। তাছাড়া, নিজের নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহার করাটাকে তিনি মনে করতেন আত্মপ্রশংসা বা অহমিকা। নামের মধ্যবর্তী 'চন্দ্র'-ও তিনি বর্জন করেন শুধু 'চারু বন্দ্যোপাধ্যায়' এই নামেই তিনি পরিচয় লাভ করেছিলেন। এ নিয়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ এবং বঙ্গবাসী, নায়ক, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকা তাঁকে 'শ্রীহীন চারু' বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি।

চারুচন্দ্র পড়তেন নানা বিষয়। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ তিনি তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন। আর পড়েছিলেন Continental literature। মেরি করেলি ও জর্জ ইলিয়ট ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। বিজ্ঞান বিষয়ের বই পড়ার আগ্রহও তাঁর কম ছিল না। এক কথায়—বিশ্ববিদ্যা আস্বাদন করার আগ্রহ তাঁর স্বভাব ছিল। বহুভাষাবিদ্ ছিলেন তিনি। সংস্কৃত ছাড়া, ফার্সী, উর্দু, ফরাসী ভাষা ও জার্মান ভাষা বেশ ভালই জানতেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী' একখানি জার্মান উপন্যাসের মূল থেকে

ভাষানুবাদ। অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁকে অনর্গল ফরাসী ভাষায় আলাপ আলোচনা করতে শুনেছিলাম বাল্যকালে।

চারুচন্দ্র ছিলেন বিশুদ্ধতম হিন্দু। তবে সংস্কারের অন্ধ পূজারী তিনি ছিলেন না। অর্থহীন সংস্কার তাঁর কাছে আমল পেত না।

স্নানাদি করে শুচি না হয়ে, ভগবানকে স্মরণ না করে তিনি জল গ্রহণ করতেন না। প্রতিদিন প্রত্যুষে গায়ত্রী মন্ত্র ও উপনিষদের বেশ কিছু শ্লোক আবৃত্তি করে তিনি প্রার্থনা করতেন--এর ব্যত্যয় হত না কোনদিন। ভগবানে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। যদিও তার বাহ্য প্রকাশ দেখা যেত না কখনোই। এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি তাঁর জীবনের একেবারে প্রত্যন্ত সীমায় পৌছে ভগবানের নিকট-সান্নিধ্য অনুভব করেন। এক পত্রে তাঁর সেই ভগবৎ-সান্নিধ্যের কথা তিনি প্রকাশ করে গিয়েছেন। চারুচন্দ্রের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে ১৯৩৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর (১লা পৌষ ১৩৪৫) শনিবার অপরাহ্ন বেলায়। ঠিক তার চারদিন আগে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শান্তিনিকেতনের আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে একটি পত্র লেখেন--এই তাঁর শেষ লেখা :

ভাই ক্ষিতিমোহন,

আজ তোমাকে আনন্দ ও গৌরবের সংবাদ জানাচ্ছি। কিছুদিন আগে আমার খুব অসুখ হয়েছিল সকল কর্মে অশক্ত হয়ে আমি স্থির করলাম যে, কদিন চুপ করে পড়ে থেকে ভগবানের নাম জপ করব। এই কথা মনে হতেই মনে উদয় হল নমঃ শিবহরিঃ এটি আমার খুব পছন্দ হল—কারণ এতে ঈশ্বরের দুটি প্রধান লক্ষণ প্রকাশিত—১। তাঁর মঙ্গলময় ও মঙ্গলকারী রূপ, এবং ২। ভগবানের পাপ তাপ-ক্লেশহারী রূপ।

আমি ভগবানের দেওয়া এই নাম জপ করতে লাগলাম। একমাস জপ করার পর যা ছিল mechanical তা হয়ে গেল spontaneous। আমার বিনা চেষ্টাতেই ফিরে ফিরে নাম জপ চলল। নিঃশ্বাসে নমঃ আর প্রশ্বাসে শিবহরি উচ্চারিত হতে লাগল।

ভগবান আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করবার জন্য আশীর্বাদ প্রেরণ করেছেন। চোখ একটু বুজলেই নানা রকম রং দেখতে পাই। মাঝে মাঝে সুঘ্রাণ পাই। সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না—চোখ বুজে ঝুঁকে বসেছিলাম—কে যেন হঠাৎ একটি কোমল কচি হাত আমার পিঠে বুলিয়ে দিয়ে গেল। বুঝলাম এ বালগোপালের হাত। ঐ রকম আর একদিন একজন বয়স্ক লোকের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম। এ যে আমার বন্ধুরই পদধ্বনি।

…　　…　　…　　…

তোমার সৌভাগ্যবান্ বন্ধু
চারু

চারুচন্দ্র চিরজীবন সংগ্রাম করেছিলেন দারিদ্র্যের সঙ্গে শেষ জীবনে দারিদ্র্যে ক্লান্ত ও জর্জরিত হয়ে চারুচন্দ্র আশীর্বাদপ্রার্থী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ

তাঁর ৫৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে চারুচন্দ্রের জন্মদিনে একটি আশীর্বাণী পাঠান। সেই

অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা
কোণে কোণে তার পুঞ্জিত হল জীবনের ভাঙা আশা।
ঘরের মধ্যে বুকের কাঁদনগুলা
উড়িয়ে বেড়ায় ধূলা।
দূষিয়া রুষিয়া উঠে নিরুদ্ধ বায়ু
শোষণ করিছে আয়ু।
যেখানে সেখানে মলিনের লাগে ছোঁওয়া,
দীপ নিভে যায়, তীব্র গন্ধ ধোঁওয়া
রোধ করে নিঃশ্বাস।
কঠোর ভাগ্য হানে নিষ্ঠুর ভাষ
ওরে দরিদ্র! চেয়ে দেখ তোর ভাঙা ভিত্তির ধারে,
অসীম আকাশ কে তারে রোধিতে পারে।
সেথা নাহি বন্ধন,
প্রভাত আলোকে প্রতিদিন আসে তব অভিনন্দন।
সন্ধ্যার তারা তোমারি মুখেতে চাহে,
তোমারি মুক্তি গাহে।
তব সত্তার মহিমা ঘোষিছে সব সত্তার মাঝে,
যেখানে ক্ষুদ্র সেখানে পীড়িত তুমি,
সকরুণ হাসি হাসিছে সেথায় দৈন্যের মরুভূমি।
তাহার বাহিরে তোমার উদার স্থান,
বিশ্ব তোমারে বক্ষ মেলিয়া করিতেছে আহ্বান।

১৮ আশ্বিন,
শুক্ল পঞ্চমী, ১৩৩৯

আগেই বলেছি যে, চারুচন্দ্র ছিলেন ভারতী-গোষ্ঠীর একজন অন্যতম লেখক। মানসিক প্রবণতায় ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকেরা ছিলেন রবীন্দ্রপন্থী। রবীন্দ্রনাথের মতই এঁদের মনের গড়ন ছিল রোমান্টিক। চারুচন্দ্র রোমান্স-রসে সমৃদ্ধ গল্প-উপন্যাস রচনায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর কোন কোন উপন্যাসে ও গল্পে রবীন্দ্র-প্রভাব আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এমন গল্প-উপন্যাসও তিনি সেদিন রচনা করেছেন যার স্বাদ-গন্ধ রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর গল্প উপন্যাস সেদিন আপন বৈশিষ্ট্যেই দেশবাসীর চিত্ত জয় করেছিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—"আমরা প্রতিমাসে উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম চারুচন্দ্রের কোন নতুন গল্প বা উপন্যাস কোনো মাসিকে প্রকাশিত হচ্ছে কি না তা দেখবার এবং পড়বার জন্য।" একটা সময় ছিল যখন চারুচন্দ্রের উপন্যাসের একাধিক সংস্করণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হয়েছে। তাঁর 'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী' উপন্যাসের বারোটি সংস্করণ হয়েছিল। এক সময়ে কথাসাহিত্যিক হিসাবে চারুচন্দ্রের খ্যাতি দেশের বাইরেও —বিদেশে পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। লণ্ডনের The Times Literary Suppliment এক সময়ে মন্তব্য করে—"Even if we grant that Rabindranath Tagore is the most original and versatile of Bengali writers, there are others who, if they had written in English, French or German, would probably have had a world-wide reputation. Such, for instance, are such daring and original novelists as Charuchandra Banerjee, Saratchandra Chatterjee and Prabhatkumar Mukherjee. (The Times Literary Supplement— July, 8, 1920.)

ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকেরা রোমান্টিক স্বপ্নমগ্নতাকে যেমন পরিত্যাগ করেননি, তেমনি প্রত্যক্ষ বাস্তবকেও তাঁরা বিস্মৃত হননি। চারুচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া গিয়েছে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। ব্যক্তিসত্তার বেদনা ও মহিমার নিঃসংশয় প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি আধুনিক যুগের সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি তাঁর রচনায় পাওয়া যায়।

ভারতী-যুগ সমাজের নীচু তলার চরিত্রকে কথাসাহিত্যে ঠাঁই দিয়েছিল 'কল্লোল', 'কালিকলম' পত্রিকা প্রকাশিত হবার অনেক আগেই। সাহিত্যের আঙিনায় অবহেলিত মানুষের অভ্যুত্থানকে অনাচরণীয় চেহারায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন চারুচন্দ্র। তিনি সেই সমস্ত মানুষের বেদনা ও বাসনাকে কথাসাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন যাকে উনিশ শতকীয় রুচিবোধ এড়িয়ে চলত। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটি বিখ্যাত গল্পের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে – সে গল্পের নাম 'বায়ু বহে পূরবৈঁয়া'।

উপন্যাসে চারুচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করার মতো। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবার জন্য তিনি কয়েকখানি বিদেশী উপন্যাসের ভাবানুসরণে প্রবৃত্ত হন। তাঁর 'আগুনের ফুলকি' প্রসপার মেরিমে-র 'কলোবা' অবলম্বনে লিখিত। এইরকম আরো কয়েকখানি উপন্যাস তাঁর আছে। যেমন—'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী' Die Bettlerin vom Pont Arts von Wilhelm Hauff অবলম্বনে, 'সর্বনাশের নেশা' প্রসপার মেরিমে-র 'কারমেন' অবলম্বনে,'দোটানা ছেঁড়া নৌকা' জাপানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক 'তুতাবাহেই'-র 'সোনো ওমোকাগো' নামক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অবলম্বনে, 'জোড়-বিজোড়' ন্যুট হামসুনের 'ভিকটোরিয়া' অবলম্বনে, 'জোড়-বিজোড়' উপন্যাসের সূচনায় চারুচন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন ন্যুট হামসুনের ভিকটোরিয়া উপন্যাস সম্পর্কে জনৈক বিদেশী সমালোচকের একটি মন্তব্য।

"This exquisite little story is told with the simplicity which belongs to great poetry."

—এই 'great poetry'-র জন্যই চারুচন্দ্র হ্যুট হামসুনের 'ভিকটোরিয়া' বাংলায় ভাবান্তরিত করার জন্য আগ্রহী হন। অদর্শনা—বালজাকের 'লা আমুর মাস্ক' অবলম্বনে রচিত। চারুচন্দ্রের বিদেশী গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী একসময়ে লিখেছিলেন—

প্রিয়বরেষু—

আপনার পিতৃদেব, সত্যেন দত্ত, মণি গাঙ্গুলী ছিলেন আমাদের তরুণ বয়সের হীরো। তাঁরা যে রুচি নিয়ে বিদেশী সাহিত্য বাছাই করে অনুবাদ করতেন—সেটা আজ আর হয় না। ইতি—সৈয়দ মুজতবা আলী।

অন্য আর এক জায়গাতেও সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন—"...বাংলা সাহিত্যের দশ-কটা জানালা এঁরা ( চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ) খুলে ধরেছিলেন—বিশ্বসাহিত্যের গুলিস্তান বোস্তানের খুশবাই এঁদের চেষ্টাতেই আমাদের সাহিত্যের অঙ্গন ভরে দেয়।"

চারুচন্দ্র যখন যে ভাষা চর্চা করেছেন, তখন তার প্রভাব তাঁর গল্প-উপন্যাসের উপর পড়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যেও অনেক বিদেশী গল্পের ভাবানুবাদ আছে। 'সওগাত' গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'তিন চারটি গল্পের প্লট বিদেশী গল্পের ভাব আশ্রয় করিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কেন্দ্রগত ভাবটি আমারই নিজস্ব, বিদেশী গল্পগুলি আমার কল্পনার অঙ্কুরকে পল্লবিত করিয়াছে মাত্র।' চারুচন্দ্রের 'ধূপছায়া' গ্রন্থে মোপাসাঁ, ত্রিওবর্গ ? দোদে, জুল লেমেৎর প্রভৃতি বিদেশী লেখকের গল্পের ভাবানুবাদ স্থান পেয়েছে।

চারুচন্দ্রের অনেকগুলি গল্প-উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য সমাজনিষিদ্ধ প্রেম বা দেহকামনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে। অসামাজিক প্রেমকে তিনি সাহস ও সহানুভূতির সঙ্গে কথাসাহিত্যে স্থান দিয়ে একদিকে যেমন প্রগতিশীলতায় উৎসমুখটিকে অবারিত করেছিলেন, তেমনি বহু ক্ষেত্রেই নর-নারীর যৌন-সম্পর্কের চিত্রাঙ্কন করে পূর্বযুগমানসের সঙ্গে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছিলেন। দেহাশ্রিত প্রেম-বর্ণনায় তাঁর কৃতিত্ব কম নয়।

"রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রেমের নানা নিগূঢ় দ্বন্দ্বজটিল রহস্যকে তাঁদের গল্প উপন্যাসে বিন্যস্ত করলেও নরনারীর দেহসচেতন যৌনবোধের উপর কখনোই তেমন দৃষ্টি দেন নি। এদিক থেকে চারুচন্দ্রের কৃতিত্ব স্বীকার্য।" ডঃ গোপিকাবিলাস রায়চৌধুরী—দুই বিশ্বযুদ্ধ দুই বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য।

চারুচন্দ্রকে অতি-আধুনিকতার পথ-প্রদর্শক হিসাবে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন। "অতি আধুনিক সাহিত্যিকেরা হয়ত জানেন না যে, চারুচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন ক্ষেত্র প্রস্তুত

করে না রাখলে এত শীঘ্র তাঁদের আবির্ভাব সম্ভব হত না। আসলে তাঁরাই অতি-আধুনিক সাহিত্যের অগ্রদূত।"—হেমেন্দ্রকুমার রায় : যাঁদের দেখেছি ॥

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"কয়েকটি গল্পে যাঁহার দৃষ্টি সমকালীন যুগ উত্তীর্ণ হইয়া অস্পষ্টভাবে উপলব্ধ ভবিষ্যতের পানে প্রসারিত হইয়াছিল, তিনি যে অতি-আধুনিক-লেখক-গোষ্ঠীর অগ্রদূত—সে সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।"

বুদ্ধদেব বসু লিখে গিয়েছেন : "তাঁর স্বকীয় রচনা এবং অন্যান্য কৃতির কথা ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে তিনি সাহিত্যে চাচিপন্থী ছিলেন না, বরং নতুনের পক্ষপাতী—অতীতের প্রতি পক্ষপাতী নন, বরং ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখ। আমরা তাঁকে আধুনিকতারই একজন অগ্রদূত হিসাবেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলাম।"—দেশ : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৩ ॥

# চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিপত্র

॥ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে লিখিত ॥

[ শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত ]

53, SIMLA STREET
CHARU BANDYOPADHYAY Calcutta, 30 April 1924
LECTURER, CALCUTTA UNIVERSITY
ASSISTANT EDITOR
MODERN REVIEW & PRABASI

সসম্মান নিবেদন,

আপনার অনুগ্রহে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর টীকার সকল সমস্যার সমাধান হয়েছে। এক বাকী আছে।—

গুজরাটে এক পাতি সুমুকুন্দ ( সুকুবিন্দ ? ) দক্ষা তাঁতি
টুরী বৈসে মহেল-মণ্ডপে।
আও সুতে বাস বুনে রাজকর নাহি গণে
ভরত রাজার অভিশাপে ॥

এই তাঁতির উপর ভরত রাজার অভিশাপ কি ? কোন্ ভরত ? —রামচন্দ্রের ভাই, দুষ্মন্তের ছেলে, জড়ভরত ?

আমি পীড়িত নতুবা স্বয়ং হাজির হতাম। আপনি দয়া করে' এটির একটু সন্ধান করলে পরম উপকৃত হব।

ভবদীয় সখ্যবদ্ধ
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ—ব্রাহ্মণ মতিলাল বংশের একটু ইতিবৃত্ত। কলিকাতায় ধনী মতিলাল বংশ প্রসিদ্ধ, তাঁদের গোত্র ও কুলজী—কি ?

চারু

14 Nilkhet Road
Sastri's House
Ramna, Dacca
7 September 1924

শ্রদ্ধাস্পদ অমূল্যবাবু,

আপনি জানেন হয়ত আমি ঢাকায় গা-ঢাকা হয়েছি। এখানকার ইউনিভার্সিটিতে আমাকে চৈতন্যচরিতামৃত পড়াবার ভার দেওয়া হয়েছে—এ গুরুভার। আপনি আমার

মুস্কিল-আসান। চৈতন্যচরিতামৃতের কোনো টীকা-টিপ্পনী আছে? যত-রকম সটীক সংস্করণ আছে যদি আমাকে জানান আমি সংগ্রহ করে' পড়তে আরম্ভ করি। তার মধ্যে যে বৈষ্ণবদর্শনতত্ত্ব আছে তার মোটামুটি ব্যাখ্যা কোথায় পেতে পারি? এই বই সম্বন্ধে সমস্ত bibliography শীঘ্র আমাকে জানালে বিশেষ উপকৃত হব।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। অনুগ্রহ করে' শীঘ্র উত্তর দিবেন।

ভবদীয় সখ্যপ্রীত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢাকা, ॰ আশ্বিন ১৩৩১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার পত্র পেতে বিলম্ব হওয়াতে সন্দেহ হচ্ছিল আপনি মোর চিঠি পান নি। আপনার অসুখের খবর শুনে দুঃখিত হলাম।

আমার সমস্ত সংস্করণের লিষ্ট চাই না, আমি চাই কেবল সটীক সংস্করণ। অথবা চৈতন্যচরিতামৃত বোঝ্‌বার পক্ষে সাহায্য হতে পারে এমন সব বইয়ের নাম।

আমি সোমবার কল্‌কাতা পৌছাব। আপনি যদি দয়া করে কল্‌কাতার বাসায়—53A বল্‌দিয়া পাড়া রোড, মানিকতলা ঠিকানায় ঐ লিষ্টটি পাঠিয়ে দেন ত বিশেষ উপকৃত হব। আমি বুধবার পরিষদে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করব।

আপনার কাছ থেকে দূরে এসে বড় অভাব অনুভব করছি। এমন পণ্ডিত বিরল যাকে জিজ্ঞাসা করে' ভ্রম বা অজ্ঞান নিরসন কর্‌তে পারি। আপনাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখে বিরক্ত কর্‌ব। আপনি স্বাভাবিক ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য গুণে ক্ষমা কর্‌বেন এ সাহস ও বিশ্বাস আছে।

ভবদীয় সখ্যপরিচিত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনা, ঢাকা। ১৭-১১-২৪

পরমশ্রদ্ধাপ্রীতিভাজনেষু

কাল গোরক্ষবিজয়ের ১১৩—১১৫, ও ১২০ পৃষ্ঠার চারিচন্দ্রভেদের বিবরণ ও ব্যাখ্যা জানবার জন্ত পত্র দিয়েছি। ১৩৭—১৪৪ পৃষ্ঠায় গোরক্ষনাথ সন্ধ্যাভাষায় মীননাথকে যে-সব কথা বলেছেন তারও ব্যাখ্যা চাই সমস্ত কথার ব্যাখ্যা অনুগ্রহ করে' লিখে পাঠালে বিশেষ উপকৃত হব।

ভবদীয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনা, ঢাকা। ৪ ডিসেম্বর ১৯২৪

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি : আপনার কন্যার বিবাহ নির্বিঘ্নে ও অনায়াসে সম্পন্ন হোক ও নবদম্পতি সুখসম্পদ লাভ করুক।

আবার আর-এক বেতালের প্রশ্ন :-আমাদের দেশের ধর্মগুরুদের আদেশ স্বীয় ধর্মমত প্রকাশ করবে না, এবং শুধু তাই নয় ধর্মমত এক, দেখাবে আর। একটি সংস্কৃত শ্লোক শুনেছিলাম তার মর্ম্মটি এইরূপ সভাস্থলের গাণপত্য আবার কোথাও শৈব কোথাও বৈষ্ণব কোথাও শাক্ত বলে' নিজের ধর্মপরিচয় দেবে। এই-ধরণের কোনো বচন যদি আপনি জানেন বা আপনার কাছে বহু পণ্ডিতের শুভাগমন হয় তাঁদের কাছ থেকে জেনে জানাতে পারেন তা হলে উপকৃত হব।

আপনার কুশল-সংবাদ প্রার্থনীয়।

ভবদীয় সখ্যগর্বিবত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনা, ঢাকা। ৯।১২.২৪

পরমশ্রদ্ধাসম্মানভাজন,

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মানসিংহ খণ্ডে দুই স্থানে ভণিতায় আছে—

কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিততন্ত্র ভগবানে' ( ৩৩ পৃষ্ঠা )
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
সেইমত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিত তন্ত্র ভগবানে। ( ৯৩ পৃষ্ঠা )

বঙ্গবাসী সংস্করণে দু জায়গায় যে-রকম ভাবে ছাপা আছে সেইরকম ভাবে 'তন্ত্র' একবার যুক্ত ও একবার বিযুক্ত করে লিখলাম। এর অর্থ আমি ধরতে পারছি না। আপনার শরণাপন্ন। মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী। রামজনী কি ?

আপনার কন্যার বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার সংবাদ পেলে সুখী হব।

ভবদীয় সখ্যগর্বিবত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহরি

৪৪ লালকেত রোড, রমনা, ঢাকা।

১৬ পৌষ ১৩৩১

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি গোরক্ষবিজয়ের যে ব্যাখ্যা পাঠিয়েছেন তা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত এবং বিস্মিত হয়েছি। কলকাতা থেকে কবি গিরিজাকুমার বসু সস্ত্রীক আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, তাই ব্যস্ত থাকায় প্রাপ্তি স্বীকার করতে বিলম্ব হল। আজ তাঁরা গেলেন

১। ভারতচন্দ্রের মানসিংহ নামক গ্রন্থাংশের ভণিতায় দু জায়গায় আছে—

কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর

পরীক্ষিততনু ভগবানে ॥

( বঙ্গবাসী সংস্করণ গ্রন্থাবলী—৩৩ পৃষ্ঠা )

ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর

পরীক্ষিত তনু ভগবানে ॥

( একেবারে গ্রন্থসমাপ্তিতে )

প্রথম স্থানে পরীক্ষিত এবং তনু একসঙ্গে ও দ্বিতীয় স্থানে দুটি শব্দ পৃথক্ পৃথক্ আছে।

২। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব মোটামুটি ৫।৭ পংক্তিতে কি জানালে উপকৃত হব।

৩। জন্মাদ্যস্য যতঃ সূত্রের অর্থ সংক্ষেপে কি ?

ক্রমশঃ

ভবদীয় সখ্যগর্বিত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনা, ঢাকা ১২ ৩ ২৬

বন্ধুবরেষু

আশাকরি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমাদের মঙ্গল। আবার জিজ্ঞাসু হয়ে শরণাপন্ন হচ্ছি। জিজ্ঞাসা এই শতপথব্রাহ্মণ ৩.২।১।২৩—২৪ পাঠটি কি ? এখানে বই নেই যে দেখি। তার মধ্যে যে "হেলবো হেলব: " শব্দ আছে তার সঙ্গে হুলুধ্বনির কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কি ? ছান্দোগ্য উপনিষদে উলুলব: আছে আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। এখন শতপথ-ব্রাহ্মণের ঐ শব্দের তাৎপর্য্য জানতে চাই।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা বুদ্ধদেবকে তথাগত বলে কেনো ? কিসে কে কোন উপলক্ষ্যে তাঁকে তথাগত বলেছেন ?

এই জিজ্ঞাসা দুটির মীমাংসা জানালে উপকৃত ও সুখী হবো।

ভবদীয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনা, ঢাকা। ১৮ ৫।২৬

বন্ধুবরেষু

বহুকাল সংবাদ পাইনি। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা পাই না। official চিঠি লিখেও কোনো প্রতিকার হয় নি তাই পরিষৎ-সম্পাদক যখন নিরুত্তর তখন বন্ধু অমূল্য-বাবুকে একটু তদারক ও তাগাদা করতে অনুরোধ করছি। ১৩৩২ প্রথম সংখ্যার পর আর কিছুই পাইনি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম-মঙ্গল, শূন্যপুরাণ, রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ্য, অথচ বইগুলি ছাপ্‌বার চাড় পরিষদের নেই। কিছু ব্যবস্থা হয় না?

আমাকে একখণ্ড করে' ঐ তিন খানি বই সংগ্রহ করে দিতে পারেন? যদি একেবারে আমার হয়ে যাবে এ-রকম ভাবে দাও দিতে পারেন, তবে অন্ততঃ মাণিক গাঙ্গুলির বইখানি যদি মাস খানেকের জন্যে ধারে পাঠাতে পারেন তো উপকৃত হই। আমার একবার দীনেশ বাবুর ভূমিকা পড়া দরকার হয়েছে।

মাণিক গাঙ্গুলি গণেশকে বৈমাত্রেয় বলেছেন এবং শিব বৃকাসুরকে হরিভক্ত করেছিলেন। এমন কথা তো কখনো শুনি নি? আপনার জ্ঞানভাণ্ডারে এর কোনো সন্ধান আছে?

ভবদীয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

CHARU BANDYOPADHYAY
LECTURER
DACCA UNIVERSITY

44, NILKHET ROAD
RAMNA, DACCA
11th March 1927

সুহৃদ্বরেষু

নমস্কারান্তে নিবেদন,

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে দোল পূর্ণিমায় এক সাহিত্যিক মজলিস হবে। আমি সেই মজলিসে দোলযাত্রার একটা ইতিহাস পড়তে চাই। রায় বাহাদুর যোগেশ রায়বিদ্যানিধির প্রবন্ধ, বিশ্বকোষ রত্নাকর্মী, পদ্ম ও স্কন্দপুরাণ, শব্দকল্পদ্রুম আমি দেখেছি। এর অতিরিক্ত কোনো মালমসলা ও উপকরণ আপনার রত্নভাণ্ডারে থাকলে আমাকে সত্বর পাঠিয়ে দেবেন বিলম্ব কর্‌বার সময় নেই। সুতরাং আপনাকে বিলক্ষণ তৎপর হতে হবে।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

ভবদীয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনা, ঢাকা। ২২- -২৭

বন্ধুবরেষু

The Anthropological Journal of Bombay 1924 খাতে হোলির প্রবন্ধ

আছে, এখানে দুষ্প্রাপ্য। আপনি কি জোগাড় করে পাঠাতে পারেন? আমি কাজ সেরে শীঘ্রই ফেরত দেবো। আমি বই সযত্নে রাখি ও ফেরত দিই তা আপনি জানেন। ঐ কাগজ ছাড়া অন্য কোনো বই পত্রিকা ইত্যাদিতে হোলি দোল সম্বন্ধে কিছু থাকলে সেগুলিও অনুগ্রহ করে পাঠালে সুখী ও উপকৃত হবো। তা হলে আমার প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করে পরিষৎ-পত্রিকায় দিতে পারি।

আশা করি আপনার সম্পূর্ণ কুশল।

ভবদীয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনা, ঢাকা। ১৫—৪—২৭

সুহৃদ্বরেষু,

Anthropological Journal পাঠিয়েছেন, তজ্জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ফেরত পাঠালাম। আমার প্রবন্ধের অতিরিক্ত কোনো তথ্য পেলাম না। শুনলাম এবার দোলসংখ্যা আনন্দ বাজার পত্রিকায় আপনার একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। সেটি যদি পাঠাতে পারেন তো উপকৃত হই। Vidyasagar College Magazine-এর যে সংখ্যায় আপনার প্রবন্ধ বেরিয়েছিলো সেই সংখ্যার বৎসর ও মাস আমি লিখে রাখতে ভুলে গেছি, আমার প্রবন্ধে স্বীকার করতে হবে, জানালে সুখী হবো।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার মঙ্গল।

ভবদীয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রমনা, ঢাকা। ২৯—৪—২৭

সুহৃদ্বরেষু

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে—

(১) "অহিংসা পরম ধর্ম" এই বাক্যটি কোন্ শাস্ত্রে আছে, কা'র উক্তি?

(২) "তেজীয়সাং ন দোষায়" বাক্যটি ভাগবতের কোন স্কন্দে আছে?

(৩) "ধর্ম এব হতো হান্তি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত" এই উক্তিটি কোন্ শাস্ত্রের বা কা'র?

(৪) শান্তিনিকেতনে উপাসনার মন্ত্র—"ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি, মা মাং হিংসীঃ।" এই মন্ত্রটি কোন্ উপনিষদের? Jacob's Concordance এ পেলাম না।

(৫) নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।

মন্ত্রটি কোন্ উপনিষদের?

অনুগ্রহ ক'রে শীঘ্র উত্তর দিলে সুখী ও উপকৃত হবো।

ভবদীয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

Dacca Hall, Ramna, Dacca

2. 11. 28

বন্ধুবর,

আপনার পত্র পেয়ে সুখীও হলাম দুঃখিতও হলাম। আপনার ন্যায় সাধু পণ্ডিত ব্যক্তিকে ভগবান যে কেন' এমন কঠিন পরীক্ষা করছেন জানি না। ভক্তের চিত্তের কালিমা দূর করবার জন্যই বোধ হয় এই অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা। আপনার বন্ধুত্ব লাভ আমার পরম ভাগ্য। আমি নিতান্ত সামান্য অকিঞ্চন, আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি কবিকঙ্কণ সম্পাদনের দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারতাম না। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার মঙ্গল। মধ্যে মধ্যে আপনার সংবাদ পেলে সুখী হব'।

ভবদীয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহরি Dacca Hall, Ramna, Dacca

১৫-৬-২৯

বন্ধুবরেষু—

কালই আপনার কথা মনে হচ্ছিল'। কালই আপনার চিঠি পেয়ে সুখীও হলাম এবং আপনার পারিবারিক সংবাদে দুঃখিতও হলাম। আপনার কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ। আপনার আদেশ আমি পালন করবো। কিন্তু কবে পারবো জানি না। সম্প্রতি আমার শরীর মন অত্যন্ত অসুস্থ অকেজো হয়ে আছে। লেখবার ইচ্ছা আগ্রহ হয় না। যদি মনকে রাজি করতে পারি, জুলাই মাসে গল্প লেখবার চেষ্টা করবো। জুন মাসের বাকী কটা দিন আমি একটু পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আছি। শনিবারের চিঠি দেখেন? এখনও কি আমার লেখার কোনো মূল্য আছে? সুশীল-বাবু (দে এবং মোহিত-বাবু (মজুমদার) আমার সহকর্মী, তাঁরা আমার প্রতিষ্ঠা সহ্য করতে পারছেন না। রামানন্দ-বাবুর পুত্রকন্যা ও কর্মচারীরাও আমার প্রতি অত্যন্ত নির্দয়; ১৫ বৎসর প্রবাসীর জন্য প্রাণপাতকর সেবার ঋণশোধ তাঁরা করছেন। ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন। জলধর-বাবুর মতন সজ্জনকে যাঁরা অপদস্থ করতে চায়, তাদের ভগবান ক্ষমা করুন।

ভবদীয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

# ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে ৮৪-তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে
## উপহৃত পুস্তক-তালিকা

অঞ্জন সেন, ২৩৯ লেক রোড, কলি-২৯

১। গাঙ্গেয় পত্র : সংকলন ১-৫ : ১৩৮২-৮৪—অঞ্জন সেন, স°

অনাদিভূষণ দাস, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৬

১। মীরকাসিম—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

২। সোনার কাঠি রূপোর কাঠি

৩। মহাযুদ্ধের সপ্তরথী

৪। রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫। বাংলাপুস্তক তালিকা : বয়েজ ওন লাইব্রেরী

৬। রামায়ণ—জয়গোপাল কবিরত্ন

৭। স্বর্ণলতা—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৮। বিংশ-শতাব্দীর কান্না : ২য় পর্ব—দিলীপকুমার সাহা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, দেখুন প্রদীপ চৌধুরী

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৯

১। বন্ধু অমল—অরুণ আইন

২। খেলার মত খেলা—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৩। তিলকের চ্যালেঞ্জ—অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

৪। লিফ্ট বয়—অরুণ আইন

৫। রবিন্সন ক্রুশো—ডেনিয়েল ডিফো

৬। কচিপাতার রং—রেবন্ত গোস্বামী

অমরমাধব গুপ্ত, ৩০২ আপার সারকুলার রোড, কলি-৯

১। বসন্ত-সোহনী, পেণ্টুভটাস, অলিঙ্গসুন্দর, সামুদ্রিক চতুষ্পদী—সৌম্যেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ২ কপি

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ১০-এ, তেলিপাড়া রোড, কলি-২৫

১। মজার মজার শিকারের গল্প—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

২। সবার প্রিয় নজরুল—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

অরুণচাঁদ দত্ত, ৩৯ ফ্রিয়ার লেন, কলি-১৩

১। মলিকিউলার কাফে—আর্কাদি এবং বোরিস স্ত্রগাতস্কী

২। তারাশঙ্করের কবি—অরুণচাঁদ দত্ত

অলকেন্দুশেখর পত্রী, পি ৪৯, ব্লক বি, লেক টাউন, কলি-৫৫

১। ডালিকে ভ'রে—অলকেন্দুশেখর পত্রী

*অশোক উপাধ্যায়, ১৭ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড, কলি-৬*

১ এক্ষণ ( শারদীয়া ১৩৮০ )—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য

২। ১২ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা ১৩৮৩—ঐ

৩। শারদীয়া ১৩৮৪ ( খণ্ড১২, নং ১-২ )—ঐ

৪। ঐতিহাসিক ( ৪নং সংকলন ) ১৩৮৩

৫। Indian Trust Act 1882 as amended up to March 1976

৬। লায়লী মজনু—আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

৭। বর্তিকা—শারদ সংখ্যা ১৩৮৩

৮। সমকালীন—বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ১৩৮৪

৯। কলকাতা ( বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা ) বর্ষা ১৯৭৫ খ্রীঃ

১০। ইন্দিরা এণ্ড কোং—জনার্দন ঠাকুর

১১। বাংলা ছোট গল্পের আলোচনা—নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১২। ক্ষণ অন্তঃপুরিকা—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩

১৪। বাংলা নাটকের প্রথম আমল—তুশান জবাভিতেল

১৫। বালুচর ( মাসিক/পাক্ষিক পত্রিকা ) জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১-চৈত্র ১৩৭৪

১৬। " " জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫-আশ্বিন ১৩৭৯

১৭। " " মাঘ ১৩৮০-ভাদ্র ১৩৮২

১৮। কৌশিকী, পৌষ ১৩৮১-কার্তিক ১৩৮৪

১৯। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা—সুশান্তকুমার মিত্র

২০। রাজা বিজয়সিংহ বিদ্যামন্দির প্লাটিনাম জয়ন্তী স্মারক পত্রিকা ১৩৮৪
শ্রীকুমার রায় স'

অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, প্রবাসী : ৭৭/২/১, লেনিন সরণী, কলি-১৩

১। প্রবাসী ; পৌষ-চৈত্র ১৩৮৩

২। " বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৮৪

অশোক চট্টোপাধ্যায় নতুন পাড়া, চন্দননগর, হুগলী

১। গোধূলি মন—কবিতা সংখ্যা ১৩৮৪ ( জুন ১৯৭৮ খ্রীঃ )

২। " —বৈশাখ ১৩৮৪

অশোককুমার কুণ্ডু, 'অশোক নিলয়', বোড়হল, পোঃ জাঙ্গিপাড়া, জেলা—হুগলী

১। বঙ্কিম উপন্যাসের উপাদান বিচার—অশোককুমার কুণ্ডু

২। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড ১৩৮০—অশোককুমার কুণ্ডু স'

৩। বঙ্কিম অভিধান : ১ম খণ্ড—অশোককুমার কুণ্ডু

৪। „ „ ২য় খণ্ড— ঐ

৫। ভারতচন্দ্র স্মারকসংখ্যা ( ১৩৮৩ )—অশোককুমার কুণ্ডু, স

৬। বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ : সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১ম খণ্ড—ঐ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাগীয় প্রধান : বাঙ্গালা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলি-৭৩

১। শরৎ-প্রসঙ্গ ও অন্যান্য প্রবন্ধ—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ মিত্র, বৌদ্ধজীবন, ইছাপুর বৌদ্ধপল্লী, ২৪ পরগনা

১। আদর্শ বৌদ্ধজীবন—আনন্দ মিত্র মহাস্থবির

আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩৯/১ জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেন, কলি-৩৬

১। শাক্তপদ-শতদল : ১ম অর্ঘ্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২ কপি

২। বালুবেলা ( একাঙ্কিকা )— ঐ। ২ কপি

ইউনাইটেড স্টেট্স ইনফরমেশন সার্ভিস ( U. S. I. S ), ৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলি-১৩

১। Morby's Memoirs—Saul Bellow

২। Humboldt's gifts—Saul Bellow

৩। The Adventures of Augie March—Saul Bellow

৪। Comparative human rights—Richard P. Clauded

৫। 119 Years of the Atlantic—Louse Desaulnersied.

উৎপলা গোস্বামী, ১১এ তিলজলা রোড, কলি-৪৬

১। ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—উৎপলা গোস্বামী

২। বাংলা গানের বিবর্তন—উৎপলা গোস্বামী

ক্ষিতিশ চক্রবর্তী, ১৬৬ বিধান পার্ক, কলি-৫০

১। 'রা' শারদীয়া ১৩৮৪। ২ কপি

২। 'রা' পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংকলন ১৯৭৮ খ্রী:

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি. ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

উত্তাল-আফ্রিকা দক্ষিণ—জ্যোতি ভট্টাচার্য

২। গৌড় বঙ্গের স্থাপত্য : ১ম পর্ব—প্রদ্যোৎ ঘোষ

৩। তিনহাজার বছরের লোকায়ত জীবন—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। কাজী নজরুলের গান—নারায়ণ চৌধুরী

৫। জীবনের চেয়ে বড়—দেবেশ দাশ

এস. ব্যানার্জী, অফিসার-ইন-চার্জ, এডুকেশনাল পাবলিকেশান : ২ নং রোনাল্ড দেশাই রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

১। রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা—দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোঃ

এস. মুখার্জী

১। The Career of Rajah Durlabhram Mahindra (Rai Durlabh) Dewan of Bengal 1710-1770—Subhashchandra Mukherjee

কন্‌স্যুলেট জেনারেল অব্‌ দি ফেডারেল রিপাব্লিক অব জার্মানী, ১ হেষ্টিংস পার্ক রোড, কলি-২৭

১। উড়ো ক্লাস ঘর—এরিখ কেস্টনার

কমল সরকার, ২।৭, টি. এন. চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৫০

১। Gaganendranath and His Cartoons—Kamal Sarker

কমলা দাশগুপ্ত, ১৮ সাদার্ন এভিনিউ, কলি-২৬

১। জনগণের অধিকার—স্বামী বিবেকানন্দ

২। মহান বিপ্লবীত্রয়

৩। বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ

৪। বাঘা যতীন স্মারক গ্রন্থ

৫। রক্তের অক্ষরে—কমলা দাশগুপ্ত

৬। অমৃতস্য পুত্রাঃ—সূর্যসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। Work and its secret—Swami Vivekananda

৮। Port Arthur—A. Stepanov

৯। Wilhelm Wilhelm Hohenzollern—Emil Luduring

১০। What to be done—Lenin

১১। The Years of War—Vassili Grossman

১২। Indian national liberation movement and Russia

১৩। Capital, vol. I—Karl Marx

কল্যাণব্রত দত্ত, তুলি কলম, ১, কলেজ রো, কলি-৯

১। দেশবন্ধু রচনা-সমগ্র

কল্যাণী দত্ত, ৪১সি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলি-২৬

১। শ্রাবস্তী—কল্যাণী দত্ত

কানাইচন্দ্র পাল, ৬০।১৩এ, গৌরীবাড়ী লেন, কলি-৪

১। ভাষাবিদ হরিনাথ দে জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ

কালীপদ ভট্টাচার্য, ১৬ সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, কলি-১৭

১। পুণ্য চরিতায়ন—কালীপদ ভট্টাচার্য

২। অশ্রু হ'ল বারুদ—দেবব্রত ভট্টাচার্য,

৩। অর্থনৈতিক পত্রিকা, ৯ম বর্ষ,—৩২শ সংখ্যা, ১৩৬৬

১০ম বর্ষ—৬ষ্ঠ, ৮ম, ৯ম-১১শ, ১৪শ, ২০শ, ২১শ,

২৪শ, ২৭শ ও ৪৯শ সংখ্যা, ১৩৬৭-৬৮

১১শ বর্ষ—১ম, ২৬শ, ২৯শ সংখ্যা, ১৩৬৮

কিশোরীদাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ হালিশহর, ২৪ পরগনা

১। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৪—কিশোরীদাস বাবাজী স'

কুমারেশ ঘোষ, ২৮।৩ আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি-৫৪

১। যষ্টি মধু, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮৪

২। মনের কথা অনেক কথা—রাইচরণ দাস

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, রসা রোড ঈস্ট, কলি-২৯

১। উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস

—কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

কে. কে. বিড়লা, বিড়লা বিল্ডিংস, ৯/১ আর. এন. মুখার্জী রোড, কলি-১

১। পিছন পানে চাই—সুধীরমাধব বসু

গণেশ লালওয়ানী, পি-২৫, কলাকার স্ট্রীট, কলি-৭

১। Jain Journal, no. 4, vol. XI, 1977

২। Bhagavan Mahavir 2500th Nirvana Mahotsava Souvenir,

—Murshidabad

৩। শ্রমণ, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৮৩

৪। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য—গণেশ লালওয়ানী

৫। এক টুকরো মানুষ—মাণিক বছাওত

৬। মহাবীর কেবলদর্শন জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৩৮৪

৭। সরাক সমাজ স্মরণিকা, ১৩৮৪

গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

১। রুপুলি মুকুট—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প

৩। মহাভারত, আদি পর্ব, ১ম খণ্ড

৪। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, অনু' ১ম ২য় স্কন্ধ

৫। কেবল দেখেছে শিয়রলতা—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, স্টেশন রোড, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা

১। হীরা মাণিক জ্বলে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চারুশীলা সেন, ৩৭ গৌরীবাড়ি লেন, কলি-৪

১। শুকতারা, আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩৮৪

জগদীশ ভট্টাচার্য, ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলি-৬

১। রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত—জগদীশ ভট্টাচার্য। ২ কপি

২। কবি ও কবিতা, ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৮৪

১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৪

জিজ্ঞাসা, ১ কলেজ রো, কলি-৯

১। শরৎচন্দ্র: পুনর্বিচার—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

২। সমালোচনা সঞ্চয়ন—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৩। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস—অতুল সুর

৪। শরৎ সন্দর্শন—জীবেন্দ্র সিংহরায়

জীবনতারা হালদার, ২২।১।১এ, সুধীর চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৬

১। অনুশীলন সমিতির ইতিহাস—জীবনতারা হালদার

ডি. বি. ইয়ুথ এণ্টারপ্রাইজ, ২/এ, কালীঘাট পার্ক, কলি-১৬

১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—নীরেন ব্যানার্জী

তুষারাভ রায়চৌধুরী, ৩৩/এ মদন মিত্র লেন, কলি-৬

১। সুধন্য ও সাবিত্রী—তুষারাভ রায়চৌধুরী

২। গল্পের দর্পণে দশজন— ঐ এবং অন্যান্য

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩১, একবালপুর রোড, কলি-৩০

১। চৈতন্য—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

২। ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরাণার ইতিহাস—ঐ

দীনেশচন্দ্র সরকার, পি ৬৪৫, ব্লক 'ও', নিউ আলিপুর, কলি-৫৩

১। Pracyavidya Tarangini—D. C. Sircar, ed.

২। Journal of Ancient Indian History, v. 1—7, 1967-1974 by D. C. Sircar ed.

দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ৯৩ আনন্দ পালিত রোড, কলি-১৪

১। A note on sub-infeudation of land and fragmentation of rights—Durgaprasad Bhattacharya and Amarendralal Sen

২। A case study of agrarian relations in a village in West Bengal

৩। বাংলা ভাষায় অর্থনীতি-চর্চা ( রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ)—দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দেবকুমার বসু, ৯/৩, টেমার লেন, কলি-৯

১। মানবপ্রেমিক সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন—শিশির দাস

২। মায়ের গৌরব—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা—সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। বহ্নিপতঙ্গ—মদন চৌধুরী
৫। সূর্য্য কেন কালো—প্রদীপ সমাদ্দার
৬। হারিয়ে যাবার নেই মানা—শ্রীপারাবত
৭। অনন্ত নক্ষত্র বীথি তুমি অন্ধকারে—শক্তি চট্টোপাধ্যায়
৮। ম্যান হার্টনি ও মর্টিনি—শিবতোষ মুখোপাধ্যায়
৯। বনাম ধূসর পৃথিবী—অসিতকুমার দাস
১০। আনন্দ ধারা—শিবব্রত দেওয়ান
১১। অবনী বনাম শান্তনু—উদয়ন ঘোষ
১২। আত্মজ তরঙ্গগুলি—কণাদ গঙ্গোপাধ্যায়
১৩। অস্থাবর প্রতিবিম্ব—রণজিৎ দাশগুপ্ত
১৪। নিষাদ—চিত্ত সিংহ
১৫। ঢেউ ওঠে মেকঙে পদ্মায়—তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬। মনের আকাশ—হরেন ঘোষ
১৭। চৌদিকে পায়ের শব্দ—সমীর চক্রবর্তী
১৮। তীরবিদ্ধা—বিকাশ মৈত্র
১৯। বিরাশীর বুক—শ্যামলী মুখোপাধ্যায়
২০। মানুষ শরৎচন্দ্র—বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
২১। বার্লিনের মধ্যরাত্র কলিকাতার ভোর—কুশল মিত্র
২২। মুসাফির—প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩। জনগণের কবি সুব্রাহ্মনিয়া ভারতী—অপূর্ব মুখোপাধ্যায়
২৪। মহামান্য মদনমোহন মালব্য— ঐ
২৫। নভেম্বর ডিসেম্বরের কবিতা—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৬। নূতন পথের যাত্রী—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়
২৭। ভোর হোল—মদন চৌধুরী
২৮। নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা : পশ্চিম দিনাজপুর—শিশির মজুমদার
২৯। দর্শক—৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৯৭৭, শারদসংখ্যা।

ধনঞ্জয় দাস মজুমদার, ৮২-১৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া

১। গৌড়াধিপতি গোপাল ও দিব্যক পরিচিতি—ধনঞ্জয় দাস মজুমদার
২। বঙ্গের অনন্ত সামন্তচক্র ও ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস—ঐ
৩। ভারত ও ভারতের বাহিরে বাঙ্গালীর অবদান—ঐ

৪। The origin and history of the Rajputs—do

৫। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস—১ম-২য় খণ্ড—ঐ

ধীরাজ বসু, ১৮।১, সাহিত্য পরিষৎ ষ্ট্রীট, কলি-৬

১। বিবেকানন্দ স্মরণিকা, ১৯৭৭—সুনীল বিহারী ঘোষ ও অন্যান্য, স'

২। „ ১৯৭৮—নীরদবরণ চক্রবর্তী, ধীরাজ বসু ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, স'

ধীরেন বসু, ৩৪/১/১এ, কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬

১। স্বর সপ্তক : A sonate of seven tunes—ধীরেন বসু

নজরুল ইসলাম, আনারপুর, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগনা

১। আরব হিলাল—নজরুল ইসলাম

২। জানালার ধারের মেয়েটি—নজরুল ইসলাম

নিরঞ্জন দাস, কারেন্ট বুক সপ, ৫৭ সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

১। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

নির্মল গুপ্ত, প্রধান সম্পাদক, কল্লোল (নব পর্যায়), জগাছা, জি. আই. প্রেস কলোনী, হাওড়া-৪।

১। কল্লোল (নব পর্যায়), বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৩

নির্মল দাশ, ১২৩।২ সি, গোপাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫

১। বাংলা ব্যাকরণ চর্চার ধারা : একটি ইতিহাস সমীক্ষা—নির্মল দাশ

নির্মল কুমার খাঁ, ১৪ মাকড়দহ রোড, কদমতলা, হাওড়া-১

১। এখন মোহনা ছেড়ে—প্রতিমা ঘোষ

২। ভালবাসিবে বলে—নির্মলকুমার খাঁ

৩। জালবোনা তকলিটি—বীণা চট্টোপাধ্যায়

৪। ভারত পাঠাগার, রজত জয়ন্তী বর্ষ, স্মারক গ্রন্থ—নির্মলকুমার খাঁ, স'

৫। ছয় রিপু, ১ম, ২য় পর্ব—ঐ

৬। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতুসংহার—অমরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু'

৭। কবিতায় শরৎ কুশীলবের মুখ—নির্মলকুমার খাঁ, স'

নির্মলকুমার দত্ত, ১১/১/৪, কেদার ভট্টাচার্য লেন, হাওড়া-৪

১। T. P. M News, vol. II, Nos. 1-2, 1977

নীরেন ব্যানার্জী, ২।এ, কালীঘাট পার্ক সাউথ, কলি-২৬

১। মদনমোহন তর্কালঙ্কার—নীরেন ব্যানার্জী

২। মানশ্রী ও পরলোকতত্ত্ব— ঐ

৩। Fate anatomy, pt. 1—Niren Banerjee

৪। মানশ্রী, ১ম বর্ষ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭৬-৭৭

ঐ ২য় বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৯৭১

৫। Stellar Massage, V 3, Nos. 7-12, 1964

V 4, Nos. 1-5, 1965

V 5, Nos. 1-12, 1967-68

V 6, Nos. 1-9, 1969

V 7, Nos. 1-12, 1930

V 8, Nos. 1-3, 1981

নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তকবি কুঞ্জ, দক্ষিণপাড়া, বৈচীগ্রাম, হুগলী

১। শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যরসায়ন, সমাপনী খণ্ড—নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিম বঙ্গ। উপ-অধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তফসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলি-১

১। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নির্দেশিকা—অমলকুমার দাস ও শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য পাড়া, বারুইপুর, ২৪ পরগনা

১। বিধুর বীণা—পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য

পুলকেশ দে সরকার, ৩১ সি হরিনাথ দে রোড, কলি-৯

১। বাঙলার বিপ্লব সাধনা—পুলকেশ দে সরকার

পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

১। বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল—প্রমথনাথ বিশী

২। শান্তিনিকেতনের ভাষণমালা—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদীপ চৌধুরী ও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলি-৩২

I. Calcutta : People and Empire (gleanings from old Journals)

প্রভাতকুমার গোস্বামী, ১১এ তিলজলা রোড, কলি-৪৬

১। বাংলা নাটকে গান—প্রভাতকুমার গোস্বামী

২। ভারতীয় সংগীতের কথা—ঐ

প্রভাসরঞ্জন দে, ৪।২ যাদব ঘোষ রোড, কলি-৬১

১। শিশু সাহিত্য ও সাহিত্যিক—প্রভাসরঞ্জন দে

২। কাশ্মীরে কয়েকদিন— ঐ

৩। গল্প আর হল্লা— ঐ

৪। সোনার পাখী— ঐ

৫। Whos Who of Indian Children's Literature—Do

ফণীন্দ্রনাথ দত্ত, তেলিরবাগ ভবন, ফ্লাট-৭, পি-৩, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১৩

১। সিলেটিকা—ফণীন্দ্রনাথ দত্ত

২। ত্রয়িকা— ঐ

বন্দিরাম চক্রবর্তী, ৪০/১ ট্যাংরা রোড, ব্লক-ডি, ফ্লাট-১২, কলি-১৫

১। বাংলার বাউল লালন ফকির—সুবোধ চক্রবর্তী

২। ভারত পথিক রামমোহন— ঐ

৩। উপকথা নয় ইতিকথা—হিতেন নাগ ও জলধিনন্দন হালদার

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—নরেশচন্দ্র জানা

বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিঃ, ৩৩ কলেজ রো, কলি-৯

১। রোমান্টিক কবি ও কাব্য—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায

২। নামের আড়ালে—জরাসন্ধ

বাসন্তী লাইব্রেরী, ২২।১ বিধান সরণী, কলি-৬

১। অনন্বয় ও আধুনিক বাংলা কবিতা—শুদ্ধসত্ত্ব বসু

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, চাকদহ, নদীয়া

১। পাঁচালী—ফেব্রুআরি-জুলাই, ১৯৭৫
জানুআরি-ফেব্রুআরি, মে ১৯৭৬

২। কুরুক্ষেত্র, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৬
জানুআরি-ফেব্রুআরি, মার্চ-জুন, ১৯৭৭

বিজয়মাধব মণ্ডল, রঘুনাথপুর, পোঃ খোলাপোতা, ২৪ পরগনা

১। এত দুঃখ চাঁদের কপালে—বিজয়মাধব মণ্ডল

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

১। রবীন্দ্রমনন—শ্রীমন্তকুমার জানা

২। বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার

৩। কবি শ্রীমধুসূদন— ঐ

৪। সাহিত্য বিতান— ঐ

৫। ভারত মহিলা—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৬। পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

৭। বিদ্যাসাগর সার্ধশত বর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ—গোলাম মুরদি, সম্পা.

৮। শতাব্দীর শিশুসাহিত্য ( ১৮১৮-১৮৬০ )—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

৯। স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

১০। কনখল—মণীশ ঘটক

১১। বাংলা প্রবন্ধ ও ভাষা শিল্প—সুশীল জানা, স'

১২। রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন—ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য

১৩। বিপ্লবের সন্ধানে—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪। লেখকদের প্রেম—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

বিপ্লব দাশ, C/o গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিজ্ঞান প্রচার সমিতি, ১৮।এ গৌরীবাড়ি লেন, কলি-৪

১। মনে পড়ে—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, ইস্টার্ন রেলওয়ে কোয়ার্টার্স, নং ৭৩।১, কলি-৩৪

১। ঝিনুক কুড়াই—বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮।১৪ নস্কর পাড়া লেন, কলি-৩১

১। একটু হাসি—বীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

বীরেন্দ্রনাথ বসু, ১৮ রাজকৃষ্ণ কুমার স্ট্রীট, বেলুড় মঠ, হাওড়া

১। বাংলার বড় লাঠি খেলা—বীরেন্দ্রনাথ বসু

২। বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু স্মরণে—ঐ

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, ৯৮।২এ তালতলা লেন, কলি-২৪

১। মিঠে কড়া মধুর ছড়া—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মনোমোহন ঘোষ ( চিত্রগুপ্ত ), ব্লক এ।১, ফ্লাট-২, এম. আই. জি. গভঃ হাউসিং এস্টেট, বেলগাছিয়া ভিলা, কলি-৩৭

১। ওয়েসিস—মনমোহন ঘোষ

মলয়েন্দ্রকুমার সেন, ক্যালকাটা পাবলিকেশনস্, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

১। বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন

মানিক ডাক্ষিত, ১ হেমচন্দ্র স্ট্রীট, খিদিরপুর, কলি-২৩

১। চাঁদের মুখে রক্ত

মানস মজুমদার, ৪ অক্রুর দত্ত লেন, কলি-১২

১। নাট্যকার তারাশঙ্কর—মানস মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩,

১। পাঞ্চজন্য—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

২। অবাক পৃথিবী—নারায়ণ সান্যাল

৩। রেস কোর্স—ধনঞ্জয় বৈরাগী

৪। পছন্দসই—মুজতবা আলি

৫। কীর্তিহাটের কড়চা ( ১ম-২য় ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগেশ ব্রহ্মচারী, গ্রাম্য যোগাশ্রম, ১১/এ, স্টেশন রোড, বালিগঞ্জ, কলি-১৯

১। শ্রীমদ্ভাগবতের রামলীলা—যোগেশ ব্রহ্মচারী

রণজিৎপ্রসাদ ঘোষ, বঙ্গীয় শিখ-সমিতি, ১১৬ কারনানী ম্যানসন, কলি-১৬

১। শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী— রণজিৎ প্রসাদ ঘোষ, স'

রতনকুমার দাস, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলি

১। হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ্ সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ( ৩৩তম অধিবেশন ) : স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৭

২। সৈকত, ( কবি করুণানিধান জন্মশত বর্ষ সংখ্যা ), ১৯৭৭

সৈকত, ( রামায়ণ সংখ্যা ), ১৯৭৭

রমেন সেনগুপ্ত, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ, স্কট লেন, কলি-৯

১। প্রণতি—রমেন সেনগুপ্ত

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৬৭ পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীট, কলি-৬

১। সাহিত্যতীর্থ, ২৩শ বর্ষ, ১৩৮৩

২৪শ বর্ষ, ১৩৮৪

২। যুদ্ধজিজ্ঞাসা, সুভদ্রা ও মিনি—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

৩। দ্বিতীয় দিগন্ত— ঐ

রূপা অ্যাণ্ড কোং, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

১। কোটী পাতার ছন্দ ( জাপানী কবিতা গুচ্ছ )—সন্দীপ ঠাকুর ও অন্যান্য,

রূপাই সামন্ত ( রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ), অন্ত স্কুল ডাঙ্গা, বাঁকুড়া,

১। আমি ফুল ভালবাসি—রূপাই সামন্ত

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

১। অগ্নিগর্ভ চাইনৎস লাইপম্যান—অশোক গুহ, অনু

২। From Opium War to Liberation—Israel Eptein

শংকর মিত্র, প্রান্তিক আবাস, ১৪ নিউ মাকড়দহ রোড, হাওড়া-১

১। সবুজ—শংকর মিত্র, স

২। জীবন-শিল্পী শরৎচন্দ্র—ঐ

৩। রাজেশ্বরী— ঐ

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনী প্রকাশনী, ১ বৈকুণ্ঠ সাহা রোড, কলি-৩২

১। রঙিন মাছের ঘর—শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

শশাঙ্ক হাইত, গ্রাম—কনকসাই, পোঃ—আতরথি, মেদিনীপুর

১। প্রতিশব্দ—শশাঙ্ক হাইত

শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

১। চতুষ্কোণ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা, ১৭শ বর্ষ, ১৩৮৪

শেফালি মিত্র, ৬৪ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯

১। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, ১ম খণ্ড—সুধীরকুমার মিত্র

২। নিশীথ চিন্তা, ৪র্থ সং—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

৩। শিলালিপি—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৪। বৃন্তচ্যুত—অরুণকুমার সরকার

৫। ব্রহ্ম সঙ্গীত, ১১শ সং (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রকাশিত)

৬। ভেষজ বিধান, ৫ম সং (এম. ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড কোং)

৭। দেবীগড় ষড়যন্ত্র—মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, স'

৮। মিলন মঙ্গল—যতীন্দ্রনাথ পাল

৯। নিষ্কর্মা—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

১০। জাতক, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড—ঈশানচন্দ্র ঘোষ

১১। মহাভারত: ২য় খণ্ড—কাশীরাম দাস,

১২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ সং (বসুমতী সংস্করণ)

১৩। সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম-৩য় খণ্ড

১৪। নারায়ণচন্দ্রের ও শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, এক খণ্ডে

১৫। সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী, ৫ম খণ্ড (বসুমতী সং)

১৬। অমৃত গ্রন্থাবলী—অমৃতলাল বসু (বসুমতী সং)

১৭। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ও নারায়ণচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, একখণ্ডে

১৮। অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী (বসুমতী সং)

১৯। ত্রৈলোক্যনাথের ও অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ, এক খণ্ডে

২০। প্রভাত গ্রন্থাবলী ও অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী, ৪র্থ ভাগ, হেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ, একখণ্ডে

২১। হেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রভাত গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ, এক খণ্ডে

২২। মাসিক বসুমতী, ১৩৩৯-১৩৪৬

২৩। বঙ্গশ্রী, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

২৪। বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩৩০-১৩৩৪

২৫। মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন, ১৩২৫-১৩৩৬

২৬। The Romance of India

২৭। Our American adventure—A. Conan Doyle

২৮। Manco: The Peruvian chief—W. H. G. Kingston

২৯। The Pilgrim's Progress—John Bunyan

৩০। The conduct of and procedure at Public Company & Local Government meetings (crew), 18th ed—O. R. Smith

৩১। Short Cruses—W. W. Jacobs

৩২। The merry men and other tales & fables —R. L. Steven son

৩৩। Sailors Knots—W. W. Jacobs

শম্ভু রক্ষিত, মহাপৃথিবী, এগারো ঠাকুরদাস দত্ত প্রথম লেন, হাওড়া-১

১। রাজনীতি, ২য় সং—শম্ভু রক্ষিত

শিশিরকুমার ঘোষ, সংকেত পাবলিশিং হাউস, এ-ভি নগর, হিন্দমোটর, হুগলী

১। আমেরিকার পথে—ডাঃ রেবতী মোহন বিশ্বাস

শুদ্ধোধন সেন, ২৫৯।২এ, এস. কে. দেব রোড, কলি-৪৮

১। স্মৃতিবর্দ্ধিত করার উপায়—মহেন্দ্রকুমারজী 'প্রথম'

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

১। ধর্ম সমীক্ষা—ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

২। অন্বেষা—প্রণবেশ কর

৩। বিজ্ঞান ভারতী—দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

৪। Essentials of Dharma : Bankim chandra Chatterji—Manomohan Ghosh

সংস্কৃত কলেজ, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-১২

১। On the concepts of Relation and Negation in Indian philosophy—Kalidas Bhattacharya

২। ভারতীয় সাধনার ধারা—গোপীনাথ কবিরাজ

৩। বেদ মীমাংসা ( ২য় )—অনির্বাণ

৪। Navyanyaya-Bhasa Pradipah—Maheshchandra Nyayaratna.

৫। Language of the under world of West Bengal—B. Mallik

৬। Padarthatattva Nirupanam—Madhusudan Bhattacharya

৭। Vedanga Jyantisam—Sitesh chandra Bhattacharya

৮। Our heritage : Vol xxiv. part I, January-June, 1976
vol. XXIV Part II, July-Dec. 1976

৯। Indian definition of mind—Amalendu Bagchi

১০। Santarasa and its scope in literature—ShasthiPada Bhattacharya

১১। Vyakti-Viveka of Rajanaka—Mahima Bhatta

১২। Vijnaptimatratasiddhi – Sukomal Choudhuri

১৩। Analytical study of Abhidharma Kosha—Sukomal Choudhuri

১৪। Padacandrika v2—Kalikumar Duttashastri

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলি-৬

১। সাহিত্য সংস্কৃতি-সভ্যতা—রজতবরণ দত্তরায়

২। ব্যঙ্গ কবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা—সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স'

৩। সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ—সত্যেন্দ্রনাথ রায়

৪। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—জাহ্নবীচরণ ভৌমিক

৫। বিভূতিভূষণ—চিত্তরঞ্জন ঘোষ

৬। মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস এর মূল্যায়ণ—কমলকুমার সান্যাল

৭। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

সঞ্জীবকুমার বসু, সম্পাদক সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলি-১

১। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৩৮৪

২। ঐ শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৪

সনৎকুমার মিত্র, কলিকাতা

১। কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস, ২য় পর্যায়—সনৎকুমার মিত্র স'

সন্দীপ রায়, ১৪ আর. জি. কর রোড, কলি-৪

১। চিত্রায়ণ, আগষ্ট ১৯৭৭

২। ঐ শারদীয়া, ১৩৮৪

সমর দত্ত, ২৬।১৩ রামকালী মুখার্জী রোড, কলি-৫০

১। ব্যাঙ্ক কর্মচারী-আন্দোলনের কথা, ১ম—সমর দত্ত

২। শ্রমিক সমস্যা ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন— ঐ

সম্পাদক, "দিগন্ত", বঙ্গভবন, ৩নং হেলী রোড, নিউ দিল্লী-১

১। দিগন্ত, রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৮৪

সরোজমোহন মিত্র, ২৩৮ মানিকতলা মেইন রোড, ফ্ল্যাট নং ৫০, কলি-৫৪

১। মানিক গ্রন্থাবলী ১৩শ খণ্ড—সরোজমোহন মিত্র স'

২। সুকান্তের জীবন ও কাব্য—সরোজমোহন মিত্র

সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণি, কলি-৬

১। সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ও রচনাপঞ্জী—নির্মলেন্দু ভৌমিক, স'

২। নাট্যকার তারাশঙ্কর—মানস মজুমদার

৩। শাহানশাহ আকবর—ননীগোপাল চৌধুরী

৪। শরৎপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য প্রবন্ধ—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকুমার মিত্র ( উমেশ সৌদামিনী সংগ্রহ ) ৩৭ বেলগাছিয়া রোড, ব্লক-'y' ফ্লাট-১৪ এল. আই. জি. হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা-৩৭

১। আমার বাংলা—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

২। নানা সাহেব—উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

৩। কার্ল মার্কস ( ১ম খণ্ড )—সুকুমার মিত্র
৪। বাঙ্গালা সাহিত্য ( ১ম খণ্ড )—মনীন্দ্রমোহন বসু
৫। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ( ১ম ও ২য় খণ্ড )—কালিদাস রায়
৬। মস্কো থেকে দেখা—কৃষ্ণ ধর
৭। সচিত্র কলকাতার কথা ( মধ্যকাণ্ড )—প্রমথনাথ মল্লিক
৮। শিশু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯। কবি ও কুকুর—সৈয়দ আবুল হুদা
১০। ভলাদিমির ইলিচ লেনিন—ভলাদিমির মায়াকোভস্কি
১১। বঙ্কিম-মানস—অরবিন্দ পোদ্দার
১২। সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী ( ১ম ভাগ ) উইলিয়ম সেক্সপীয়র ( বসুমতী সং )
১৩। নতুন দিনের রুশ কবিতা—মনীন্দ্র রায় অনূং
১৪। ভারতের মুক্তি সন্ধানী—যোগেশচন্দ্র বাগল
১৫। শাক্ত-পদাবলী ( চয়ন )—অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত
১৬। আমাদের ছেলেমেয়ে—শ্রীমতী কালা গোস্বামী
১৭। বাংলার প্রাচীন কাব্য—অনিল কাঞ্জিলাল
১৮। সাজাহান ( নাটক )—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
১৯। বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
২০। ইলা মিত্র—গোলাম কুদ্দুস
২১। অপরাজিতা—যতীন্দ্রমোহন বাগচী
২২। মহাভারতী— ঐ
২৩। জীবন-মৃত্যু—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
২৪। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
২৫। রৌদ্র ধারা—কনক মুখোপাধ্যায়
২৬। সমালোচনা-সংগ্রহ [ ৫ম সংস্করণ ]—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৭। একেই কি বলে সভ্যতা ?
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২৮। বৈষ্ণব পদাবলী [ চয়ন, ২য় সংস্করণ ]—দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সং।
২৯। রবি রশ্মি ( পূর্ব ভাগ )—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্লেষিত
৩০। রবি রশ্মি ( পশ্চিম ভাগ )— ঐ
৩১। পরিষৎ-পরিচয়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২। উইলিয়ম ইয়েট্‌স্‌, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত—যোগেশচন্দ্র বাগল।
৩৩। স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪। হরিনাথ মজুমদার ( কাঙ্গাল হরিনাথ )—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫। কাব্যকুসুমাঞ্জলি—শ্রীমানকুমারী বসু
৩৬। চয়নিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৭। পাতালমঞ্জরী—ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়
৩৮। ভারতচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থাবলী—দে ব্রাদার্স প্রকাশিত
৩৯। শ্রীগীতগোবিন্দম্—অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সং
৪০। অপমানিতা মানবী—প্রশান্তি দেবী।
৪১। প্রাচীন রুশের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা ( ১ম পর্ব )—অসিত চক্রবর্তী
৪২। হট্টমালার দেশে—প্রভাতকুমার গোস্বামী
৪৩। শিল্পীর নবজন্ম—রম্যাঁ রলাঁ
৪৪। বৈষ্ণব পদরত্নাবলী—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত
৪৫। নব-কথা ( গল্প )—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৬। গৌরী-গ্রাম—রমেশচন্দ্র সেন
৪৭। ঘরে-বাইরে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৮। কুর-পালা—রমেশচন্দ্র সেন
৪৯। ঘরের ঠিকানা—সুশীল জানা
৫০। আধুনিক বাংলা কাব্য ( ১ম পর্ব )—তারাপদ মুখোপাধ্যায়
৫১। সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার
৫২। জাতকমঞ্জরী—ঈশানচন্দ্র ঘোষ, সং
৫৩। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৪। মারাং গম্‌কে লেনিন—রেঙ্গেচ্ করেন ভূর্কীঃইগিল্
৫৫। বাঙ্গালা ও রুশ লোকসাহিত্য—মনোরঞ্জন মাইতি
৫৬। বাংলা সাহিত্যে গদ্য ( ১ম খণ্ড )—সুকুমার সেন
৫৭। জীবনের ঝরাপাতা—সরলা দেবী
৫৮। ইয়োরোপা—দেবেশচন্দ্র দাশ
৫৯। বাংলা উপন্যাসের ধারা—অচ্যুত গোস্বামী
৬০। পুরনো বই—নিখিল সেন
৬১। বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা—অসিতকুমার ভট্টাচার্য
৬২। হিউ এন চাঙ—সত্যেন্দ্রকুমার বসু
৬৩। সামাজিক চুক্তি—জাঁ জাক রুশো
৬৪। বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ—আশা গঙ্গোপাধ্যায়
৬৫। মধুসূদনের কবিমানস—শিশিরকুমার দাশ
৬৬। অর্থনীতি ও করতত্ত্ব—ডেভিড রিকার্ডো, অনুবাদক : সুধাকান্ত দে

৬৭। মার্শাল প্ল্যান—এ. লিয়নটিয়েভ

৬৮। ভারতের অর্থনীতিক বিকাশের ধারা—সুনীলকুমার সেন

৬৯। দার্শনিক প্রবন্ধাবলী ( মার্কসবাদের ভূমিকা )—নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

৭০। দেহ প্রাণ মন—অসিত সেন

৭১। বিশ্ব-পরিচিতি—স. ক. ফসেখসভিয়াৎস্কি

৭২। আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত

৭৩। পল্লী বৈচিত্র্য—দীনেন্দ্রকুমার রায়

৭৪। গঙ্গাপদ বসু স্মারক গ্রন্থ—শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বদেশ বসু সম্পাদিত

৭৫। গীতিকবি শ্রীমধুসূদন—আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭৬। মার্কসীয় অর্থনীতি—এ. লিয়নটিয়েভ

৭৭। রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন—ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য

৭৮। কালিদাসের শকুন্তলা—শক্রজিৎ দাশগুপ্ত, অনুবাদক ও সম্পাদক

৭৯। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক—শক্রজিৎ দাশগুপ্ত, অনুবাদক ও সম্পাদক

৮০। নানা প্রবন্ধ—রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৮১। প্রবন্ধ সংকলন—রমেশচন্দ্র দত্ত

৮২। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

৮৩। রবীন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার ধারা—আদিত্য ওহদেদার

৮৪। প্রসূতি ও শিশু—ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৮৫। মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ—সুশোভনচন্দ্র সরকার

৮৬। রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী—চিন্মোহন সেহানবীশ

৮৭। মানুষের ঠিকানা—অমল দাশগুপ্ত

৮৮। পৃথিবী ও আকাশ—আ. ভলকভ

৮৯। পৃথিবীর ইতিহাস ( ১ম খণ্ড )—দুর্গাদাস লাহিড়ী

৯০। রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন—গৌতম চট্টোপাধ্যায়

৯১। যশোহর খুলনার ইতিহাস ( ১ম খণ্ড )—সতীশচন্দ্র মিত্র

৯২। প্রারম্ভ—সৈয়দ আবদুল হুদা

৯৩। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৯৪। আলো ও ছায়া—কামিনী রায়

৯৫। চর্যাপদ—অতীন্দ্র মজুমদার

৯৬। নির্বাসিতের আত্মকথা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯৭। শিল্পীর নবজন্ম ( ২য় খণ্ড )—রমঁ্যা রলাঁ

৯৮। শেষ প্রান্তর—ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়

৯৯। সাক্ষী—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

১০০। ভারতীয় দর্শন ( ১ম খণ্ড )—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১০১। রাষ্ট্রনীতি—বিপিনচন্দ্র পাল
১০২। রামায়ণ ( আদিকাণ্ড )—মহাকবি কৃত্তিবাস, নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত
১০৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী ( ৫ম ভাগ )—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০৪। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা—নরহরি কবিরাজ
১০৫। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায়
১০৬। মানব সমাজ ( ১ম খণ্ড )—রাহুল সাংকৃত্যায়ণ ত্রিপিটকাচার্য, সুবোধ চৌধুরী অনু.
১০৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—ভূদেব চৌধুরী
১০৮। সমবায় নীতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০৯। প্রফুল্ল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
১১০। বেদান্ত বাচস্পতি যদুনাথ ( জীবন ও বাণী )—ডঃ মতিলাল দাশ
১১১। হাওড়া জেলার লোক উৎসব—তারাপদ সাঁতরা
১১২। শ্রীকান্ত ( ২য় পর্ব )—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১৩। রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা—অশোক সেন
১১৪। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা ( ১ম খণ্ড )—অশোক সেন
১১৫। মুক্তি পাঠ আন্দামান—নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৬। সোবিয়েতের দেশে দেশে—মনোজ বসু
১১৭। শ্রীকান্ত ( ৩য় পর্ব )—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১৮। শ্রীকান্ত ( ৪র্থ পর্ব )— ঐ
১১৯। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন —যোগেশচন্দ্র বাগল
১২০। বাঘা যতীন—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়
১২১। ললিতের ওকালতী—ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
১২২। রতন মুণ্ডা ও কয়েকটি গল্প—লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া
১২৩। আমার ডায়েরী থেকে—ম্যাক্সিম গোর্কি
১২৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোপন তথ্য—জি. দেবোরিন
১২৫। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৬। পৃথিবীর ঠিকানা—অমল দাশগুপ্ত
১২৭। জলধর সেনের আত্মজীবনী—লিপিকার নরেন্দ্রনাথ বসু
১২৮। আমার জীবনী—মীর মশার্‌রফ হোসেন, দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

১২৯। রবির আলোকে শান্তিনিকেতন—সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৩০। শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত

১৩১। মার্কসবাদ বনাম মাওবাদ—প্রদ্যোৎ গুহ

১৩২। ফোকলা দিগম্বর—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৩। সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী [ ৫ম ভাগ ]—[ বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ ]

১৩৪। লেখা ও রেখা, ১৭শ বর্ষ : শ্রাবণ, ১৩৭৯-আষাঢ়, ১৩৮০

১৩৫। সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৬৮ তম বর্ষ : সংখ্যা ১-৪

১৩৬। বাংলা কবিতা বার্ষিকী, ১৩৭৫

১৩৭। সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব

১৩৮। জয়ন্তী উৎসব স্মারক-গ্রন্থ [ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ]

১৩৯। ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড [ বসুমতী ]

১৪০। বঙ্গাধিপ-পরাজয়—প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, [ বঙ্গবাসী ]

১৪১। দামোদর গ্রন্থাবলী [ বসুমতী ]

১৪২। বাংলা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪৩। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি, ১৯৬৪

১৪৪। বঙ্গবাণী, ৪র্থ বর্ষ : ফাল্গুন ১৩৩১-শ্রাবণ ১৩৩২

১৪৫। সপ্তাহ, ১ম বর্ষ : আগস্ট ১৯৬৭-আগস্ট ১৮৬৮

১৪৬। বিংশশতাব্দী, ১ম বর্ষ : আষাঢ়-মাঘ ১৩৬৩

১৪৭। অগ্রণী, ১ম বর্ষ : বৈশাখ-চৈত্র ১৩৫৫ ; ২য় বর্ষ, বৈশাখ-মাঘ ১৩৫৬

১৪৮। বিচিত্রা, ১ম বর্ষ : আষাঢ়-অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

১৪৯। বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা, ২২শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৭২-আষাঢ় ১৩৭৩

১৫০। মুখপত্র, ১ম বর্ষ : আষাঢ় ১৩৫৯-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ; ২য় বর্ষ : আষাঢ়-চৈত্র ১৩৬০

১৫১। আশাবরী, ১ম বর্ষ : আশ্বিন ১৩৬৭-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

১৫২। এষা, ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা ১৩৭৩; ২য় বর্ষ : ১৩৭৪-৭৫ ; ৩য় বর্ষ : ১৩৭৫-৭৬

১৫৩। নতুন পরিবেশ, ২য় বর্ষ : বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩৭২

১৫৪। প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩০-চৈত্র ১৩৩১

১৫৫। পরিচয়, ১৫শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৫২-আষাঢ় ১৩৫৩
১৬শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৫৩-আষাঢ় ১৩৫৪
১৭শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৫৪-আষাঢ় ১৩৫৫
১৮শ বর্ষ : কার্তিক ১৩৫৫-চৈত্র ১৩৫৫
২০শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৫৭-আষাঢ় ১৩৫৮

২১শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৫৮-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯

২২শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৫৯-আষাঢ় ১৩৬০

২৩শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৬০-আষাঢ় ১৩৬১

২৪শ বর্ষ : ফাল্গুন ১৩৬১-আষাঢ় ১৩৬২

২৫শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৬২-আষাঢ় ১৩৬৩

২৬শ বর্ষ : ভাদ্র-ফাল্গুন ১৩৬৩

২৭শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৬৪-আষাঢ় ১৩৬৫

২৮শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৬৫-আষাঢ় ১৩৬৬

২৯শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৬৬-আষাঢ় ১৩৬৭

৩০শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৬৭-আষাঢ় ১৩৬৮

৩১শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৬৮-আষাঢ় ১৩৬৯

৩২শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৬৯-আষাঢ় ১৩৭০

৩৩শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৭০-আষাঢ় ১৩৭১

৩৪শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৭১-আষাঢ় ১৩৭২

৩৫শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৭২-আষাঢ় ১৩৭৩

৩৭শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৭৪-আষাঢ় ১৩৭৫

৩৮শ বর্ষ : শ্রাবণ ১৩৭৫-আষাঢ় ১৩৭৬

সুধাকান্ত দে, ৫৮/৬, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি-৬

১। Raja Rammohan Roy—S. K. De

সুবোধ সেনগুপ্ত, ৩০, তালপুকুর রোড, কলি-৩০

১। মাহিলাড়ার ইতিহাস ১ম—সুবোধ সেনগুপ্ত

সুবোধকুমার চক্রবর্তী, কলিকাতা।

১। একজন লামা ও মানস সরোবর—সুবোধ চক্রবর্তী

২। কানাড়া দেখা হোল না— ঐ

৩। কেরালার উপকূলে— ঐ

৪। কাশ্মীরী বাহার— ঐ

৫। বাঁধ ভেঙ্গে দাও— ঐ

সুবোধ সেনগুপ্ত, আলোর যাত্রী সাহিত্য সংঘ, ১২৮ এস. কে. দেব রোড, কলি-২৮

১। কষ্টিপাথর—এম. ডি. ইউসুফ আলি ও এ. রসিদ

২। মুক্তির মশাল—শান্তনু মহারাজ

সুবোধচন্দ্র বসু রায়, ৭/১৮ নেতাজী নগর, কলি-৪০

১। জীবনদর্শন ও বেদান্তসার—সুবোধচন্দ্র বসুরায়

সুশীল মুখোপাধ্যায়, ৮/৫৯ ফার্ন রোড, কলি-১৯

১। আশ্চর্য মিলন মেলা—সুশীল মুখোপাধ্যায়
২। অমিত্রাক্ষর— ঐ
৩। তথাস্তু— ঐ
৪। তোমার হলো শুরু— ঐ

হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

১। শ্রীমদ্‌ভাগবত—ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, অনু

হরিপদ চক্রবর্তী, ১৭ ডি/১এ, রানী ব্রাঞ্চ রোড, কলি-২

১। বৈষ্ণব পদ নৈবেদ্য—হরিপদ চক্রবর্তী ও শিবচন্দ্র লাহিড়ী, সং
২। বিদ্যাসাগর স্মরণিকা—হরিপদ চক্রবর্তী, সং

হরিসাধন ভট্টাচার্য, ৭।২ পি. ডব্লিউ, ডি রোড, কলি-৩৫

১ পথের আলো, ৪৮ সংখ্যা, ১১শ বর্ষ, ১৩৮৩
২ তুলসী মহিমামৃত—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
৩ শ্রীশ্রীনর্মদা মহিমামৃত— ঐ
৪ গুরু মহিমামৃত— ঐ
৫ Light in darkness—Sitaram Omkarnath
৬ শ্রীশ্রী সীতারাম ওঙ্কারনাথ—পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রগীতি—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
৮ শ্রীশ্রীরামনাম মাহাত্ম্য— ঐ
৯ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম লীলা— ঐ
১০ শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত— ঐ
১১ শ্রীশ্রীচণ্ডী ( ২ কপি )— ঐ
১২ মাতৃগাথা— ঐ
১৩। মাতৃপূজা— ঐ
১৪। মহারসায়ন (অন্য কপি হিন্দীতে )—ঐ
১৫। অশ্রুবাদল— ঐ
১৬। শ্রীশ্রীগুরু গীতা— ঐ
১৭। কথা, রামায়ণ ঐ
১৮। শিব বিবাহ— ঐ
১৯। ব্রহ্মানুসন্ধান, ১ম, ২য়— ঐ
২০। ললনামঙ্গল গীতামৃত—যামিনীকান্ত সাহিত্যভূষণ
২১। পরমকথা ( হিন্দী ),—সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

২২। ব্রজনাম কথা—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
২৩। গঙ্গামহিমামৃত— ঐ
২৪। আঁধারে আলো ( ৫ কপি )— ঐ
২৫। শব সাধনা— ঐ
২৬। প্রেম গাথা— ঐ
২৭। আনন্দ সংবাদ— ঐ
২৮। পিতা পুত্র— ঐ
২৯। নাম মহিমাগীতি— ঐ
৩০। পুরুষোত্তম— ঐ
৩১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— ঐ
৩২। পঞ্চরত্ন— ঐ
৩৩। মরণ জয়— ঐ
৩৪। দুটি কথা— ঐ
৩৫। মহামন্ত্র কল্পতরু— ঐ
৩৬। পরম পথ— ঐ
৩৭। সুধার ধারা— ঐ
৩৮। যুগবাণী— ঐ
৩৯। সই— ঐ
৪০। প্রসন্ন পথিক— ঐ
৪১। নামাবতার— ঐ
৪২। আর্য রমণী— ঐ
৪৩। গোপী গীতা— ঐ
৪৪। The saint of Dumurdaha—Sadananda Chakrabarty
৪৫। দয়াল গাথা—রামদয়াল মজুমদার
৪৬। শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
৪৭। হরিনাম রত্নম্— ঐ
৪৮। বাণী বিলাস— ঐ
৪৯। Woman—Sitaram Omkarnath
৫০। Hope abounding— ঐ
৫১। Chanting of the name— ঐ
৫২। Sitaramdas Omkarnath—A. C. Bose
৫৩। অভয়বাণী ( হিন্দী ও বাংলা )—সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ
৫৪। গুরুগীতা— ঐ

৫৫। ত্রৈকালিক—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
৫৬। ক্ষেপার ঝুলি— ঐ
৫৭। ওঙ্কারনাথ রচনাবলী— ঐ
৫৮। সতী সঙ্ঘ— ঐ
৫৯। মকার বাবা—শ্রীক্ষেপা— ঐ
৬০। শিবনামামৃত লহরী— ঐ
৬১। প্রেমগীতি— ঐ
৬২। তর্করত্নের প্রবোধ—পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৩। গঙ্গাতীরে গীতালি—দিলীপকুমার রায়
৬৪। নারীর ব্রহ্মচর্য—গঙ্গা দেবী
৬৫। সামবেদ সন্ধ্যা—রঘুনাথ
৬৬। জাতীয় সংস্কৃতি ও মর্যাদা—বটুকনাথ ভট্টাচার্য
৬৭। বিরহি মাধব—বিষ্ণু সরস্বতী
৬৮। স্তবমালা—সদানন্দ চক্রবর্তী
৬৯। নদীয়া সাগর—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
৭০। জগজ্জননী সতীরমণী— ঐ
৭১। আর্য্য শাস্ত্র— ঐ

হারাধন দত্ত, বালটিকুরী গভর্নমেণ্ট হাউসিং এস্টেট, ব্লক-পি, ফ্ল্যাট-৯, হাওড়া

১। এই স্বর এই মন—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
২। নতুন আলো—দীপেন রাহা
ইস্পাতের ফলা—প্রবোধ সান্যাল
গোল্ড ফ্রেম—হরিপদ ঘোষ
ব্ল্যাক অ্যারো—ভূপেন ভট্টাচার্য
দয়িতা—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

হাশিরাশি দেবী, ৩ রামজয় শীল লেন, কলি-৬

১। স্ব-নির্বাচিত কবিতা—হাসিরাশী দেবী

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ১/ডি, গৌরীবাড়ী লেন, কলি-৪

১। যুগান্তর শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৩, ১৩৭৭-৭৯, ১৩৮১-৮৩
২। মহাসাধক নিগমানন্দ—মুকুন্দলাল দে

হৃষীকেশ ঘোষ, সমাজসেবী পাবলিকেশন, শিবপুর, হাওড়া

১। জৈবনিক ফ্যালাসী—হৃষীকেশ ঘোষ
২। My poetic thoughts—Hrishikesh Ghosh

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা-১৪

১। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে কোটালি পাড়া সম্মিলনীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

## বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌-এর ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতি

৮৫-তম বর্ষ

**সভাপতি**

ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল )

**সহ সভাপতি**

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

**সম্পাদক**

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

**সহকারী সম্পাদক**

শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী
শ্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য

**কোষাধ্যক্ষ**

ডঃ কানাইচন্দ্র পাল

**গ্রন্থশালাধ্যক্ষ**

ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

**পত্রিকাধ্যক্ষ**

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

**পুঁথিশালাধ্যক্ষ**

ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী

**চিত্রশালাধ্যক্ষ**

শ্রীদেবকুমার বসু

**সদস্যবৃন্দ :**

শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ
শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপুলকেশ দে সরকার
ডঃ অশোককুমার কুণ্ডু
শ্রীদুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
শ্রীকার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ
শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল
শ্রীনিখিলরঞ্জন নাহা
শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
শ্রীকল্যাণী দত্ত
ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী
শ্রীসনৎকুমার মিত্র
ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীধীরাজ বসু
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

**শাখা-পরিষৎ প্রতিনিধি :**

নৈহাটি শাখা— শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

নবদ্বীপ শাখা – শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

মেদিনীপুর শাখা — ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী

কৃষ্ণনগর শাখা— শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

**ন্যাসরক্ষক সমিতি :**

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রীঅশোককুমার সরকার

ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়

ডঃ কানাইচন্দ্র পাল ( কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে )

## ॥ উপসমিতি

### ছাপাখানা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়—সভাপতি

শ্রীদেবকুমার বসু—আহ্বায়ক

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

শ্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য

শ্রীঅশোক কুণ্ডু

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

শ্রীজগন্নাথ ঘোষ

শ্রীসনৎ মিত্র

শ্রীঅরুণ ঘোষ

### পুস্তক-প্রকাশ

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য—সভাপতি

শ্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য—আহ্বায়ক

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

শ্রীপুলকেশ দে সরকার

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

শ্রীকার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ নস্কর

### গ্রন্থাগার

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস—সভাপতি

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়—আহ্বায়ক

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

শ্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশিবদাস চৌধুরী

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়

## চিত্রশালা

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী—সভাপতি
শ্রীদেবকুমার বসু—আহ্বায়ক
শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য
শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন
শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
শ্রীস্বপন বসু
শ্রীনিখিলরঞ্জন নাহা
শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

## আয়-ব্যয়

শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়—সভাপতি
শ্রীকানাইচন্দ্র পাল আহ্বায়ক
শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক
শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী
শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়
শ্রীতুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহারাধন দত্ত
শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ
শ্রীধীরাজ বসু
শ্রীপুলকেশ দে সরকার (পদত্যাগ)
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার (শ্রীপুলকেশ দে সরকারের স্থলে)

## শাখা-সমিতি

### সাহিত্য

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক—আহ্বায়ক
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী
শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য
শ্রীকুমারেশ ঘোষ
শ্রীমনোজ বসু
শ্রীরেখা চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি
শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

### দর্শন

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক—আহ্বায়ক
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়
শ্রীকানাইচন্দ্র পাল
শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়
শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক
শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকামিনীকুমার রায়
শ্রী মন্মথবন্ধু দত্ত
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

### বিজ্ঞান

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক—আহ্বায়ক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

### ইতিহাস

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক—আহ্বায়ক
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায় | শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার
শ্রীকানাইচন্দ্র পাল | শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীদেবকুমার বসু | শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী | শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন
শ্রীঅরবিন্দ গুহ | শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
শ্রীঅতীশচন্দ্র সিংহ | শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীত্রিদিবেশ বসু | শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত | শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষাল
শ্রীঅলোক রায় | শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

## অর্থনীতি

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক—আহ্বায়ক | শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় | শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার | শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকানাইচন্দ্র পাল | শ্রীসুধাকান্ত দে
শ্রীদেবকুমার বসু | শ্রীঊষা সেন

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বাঙালী জাতির গর্ব

**সৌন্দর্য-তত্ত্ব**

অভয়কুমার গুহ ॥

প্রকাশকাল : ১৯১৬ টা. ২·০০

**গঙ্গামঙ্গল** [ সা. প. গ্রন্থাবলী ৫৪ ]

দ্বিজ মাধব প্রণীত ॥ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ।

প্রকাশকাল : ১৩২৩ টা. ·৭৫

**লেখমালানুক্রমণী** : ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ [ সা. প. গ্রন্থাবলী ৬৯ ]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥

প্রকাশকাল : ১৩৩০ টা. ·৭৫

**মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা** [ সা. প. গ্রন্থাবলী ৫৭ ]

ভবানীশঙ্কর দাস প্রণীত ॥ রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ॥

প্রকাশকাল : ১৩২৩ টা. ১·০০

**ধ্রুবা** [ উপন্যাস ]

লীলা দেবী : প্রকাশকাল : ১৩৩০ টা. ২·০০

**রূপহীনার রূপ** [ উপন্যাস ]

লীলা দেবী । প্রকাশকাল : ১৩৩০ টা. ২·০০

**বিষ্ণুমূর্তি পরিচয়** [ সা. প. গ্রন্থাবলী ৩১ ]

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ ॥

প্রকাশকাল : ১৩১৭ টা. ·৩৭

**গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস** [ সা. প. গ্রন্থাবলী ৬২ ]

বাসুদেব ঘোষ প্রণীত । মুনসী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সং ॥

প্রকাশকাল : ১৩২৪ টা. ·৩৭

**বাঙ্গালা শব্দকোষ : ৪র্থ খণ্ড** [ সা. প. গ্রন্থাবলী ৩৮

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংকলিত ।

প্রকাশকাল : ১৩২২ টা. ১·০০

**শ্রীকৃষ্ণবিলাস** [ সা. প. গ্রন্থাবলী ৬৫ ]

শ্রীকৃষ্ণ দাস প্রণীত । অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ।

প্রকাশকাল : ১৩২৬ টা. ·৮৮

---

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, সম্পাদক ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত,
শ্রীহরি প্রিণ্টার্স ও বঙ্গবাণী প্রেস হইতে মুদ্রিত ।